অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(একত্রিংশতম খণ্ড)

—:*:—

(১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা
১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুনরায় বলি, একজনকে যে পত্র লিখি, তাহা তোমাদের সকলের জন্য, সকল স্থানের জন্য এবং সকল কালের জন্য। যার যে উপদেশটী কাজে লাগে, সে সেইটী গ্রহণ করিবে। এগুলি ব্যক্তিগত পত্র হইলেও লক্ষ্যস্থল তোমরা প্রত্যেকে। অতএব নিজ নিজ পত্র সাধ্যমত সকলকে দেখাইবে।

ছোট, বড়, নামী, অনামী প্রত্যেককে কাজে নামাইয়া দাও। সকলের প্রভাবের ক্ষেত্র এক নহে। প্রত্যেকে যার যার প্রভাবের

ক্ষেত্রে আগে কাজ করুক, কারণ সেখানেই তাহার কাজ সহজে সফল হইবার সম্ভাবনা বেশী। তুচ্ছ বলিয়া কাহাকেও হেলা করিবে না। ছোট বলিয়া কাহাকেও মনে করিবে না। সে যে আমার সন্তান, এই পরিচয়টুকুই তাহার কৌলীন্য, ইহা জ্ঞান করিবে। ভগবন্নির্দ্দেশেই তোমরা আমার সন্তানত্ব পাইয়াছ, ইহার মধ্যে চালাকি বা ক্যানভাসিং এর কোনও স্থান ছিল না। এক সন্তান অপর সন্তানকে কেন আপন জ্ঞান করিবে না? কেন এক গুরুভাই অন্য গুরুভাইয়ের সহিত ব্যবহারে ঘনিষ্ঠ, আত্মীয় এবং আদর্শস্থানীয় হইবে না? একের ভুল, ত্রুটি, পাপ নিবারণও অপরের কর্ত্তব্য।

তোমরা নিজেদের জেলাটাকে একেবারে তুলাধুনা করিয়া ছাড়িবে, এই পণ কর। তোমরা জেলাটা চষিয়া ফেলিবার আয়োজন কর। মণ্ডলীর পর মণ্ডলী সৃজন করিয়া কর্ম্মের উদ্দীপনাকে সর্ব্বপল্লীতে প্রসারিত কর, কর্ম্মের স্রোতকে সর্ব্বস্তরে প্রবাহিত কর।

অখণ্ড-আদর্শের প্রচার বাক্যচ্ছটায় হইবে না, হইবে অখণ্ড-দীক্ষিতদের জীবনের আচরণে। এই একটা কথাকে আমি একেবারে মূল বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি। তোমরা তোমাদের জীবন-চর্য্যার মধ্য দিয়া এই কথাটাকে সুসম্মানিত স্বীকৃতি দাও। দলে দলে আসিয়া দীক্ষামণ্ডপে ঢুকিবে আর তারপরে জীবন-কর্ম্মে একটুকুও চেষ্টা করিবে না আমাদের আদর্শানুগত হইতে, ইহা সত্যই মর্ম্মান্তিক।

দীক্ষা নিলেই কেহ অখণ্ড হয় না। দীক্ষা নিবার পরে একদিকে করিতে হয় অনন্য-মনে সাধন, অন্য দিকে করিতে হয় চিন্তাজগতের আমূল পরিশোধন। কিন্তু আমার চিন্তার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তোমরা অধিকাংশেই আমার রচিত সাহিত্য পাঠ কর না। পূর্ব্বে

তাই আমি এমন অনবসর নহি যে, গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঘরে ঘরে বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাদিগকে বাক্যামৃত পান করাইলাম। আকৈশোর আমি এই পরিশ্রমটা করিয়া আসিয়াছি। করিয়া আসিয়াছি পদব্রজে মাইলের পর মাইল হাটিয়া, করিয়া আসিয়াছি শূন্যোদরের ক্ষুধার জ্বালাকে শক্ত হাতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া, করিয়া আসিয়াছি আমার পক্ষে দুর্লভ দুই চারিটা টাকা-সিকি-দুয়ানি নিঃশেষে খরচ করিয়া। বিনিময়ে কাহারও কাছে কিছু চাহি নাই, কাহারও কাছে কিছু পাইবার প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু এখনো কি আমার সেই বয়স, সেই স্বাস্থ্য, সেই অবাধ বিচরণের সর্ব্বতোভাব স্বাধীনতা আছে?

মণ্ডলী গড়িয়াই যদি চাঁদা রে, জমি রে, মন্দির রে ইত্যাদি হাজার জটিলতার সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে মণ্ডলীর কর্ম্মীদের মন বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। বহির্ম্মুখ মন দিয়া ত আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন সম্ভব নহে। অনেক স্থানে প্রধানতঃ এই কারণেই মণ্ডলীর জমজমাট ভাবটা হইতেছে না। পদাধিকার লাভের লোলুপতাও অন্যতম কারণ। কাহারও মনে পদাধিকারের কামনা জাগিলে সে আর অন্য কোনও সহকর্ম্মীর প্রাধান্য সহিতে পারে না। অন্য যে-কাহারও ভালো কথাটীও তাহার কাছে তিক্ত-কটু-কষায়-স্বাদ লাগে। কূট-কৌশল চালাইবার বুদ্ধি তাহার মস্তিকে একবার ঢুকিলে সে মণ্ডলীর একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে।

হতাশ না হইয়া শুধু সমবেত উপাসনাটুকুই যে-কোনও প্রকারে চালু রাখ। উপাসনার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে যাহা হইবার হইবে। অতিরিক্ত ব্যস্ততার বা ব্যগ্রতার কোনও প্রয়োজন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতার মূল্য অধিক কিন্তু নির্ম্মাণ-কর্ম্মে সুধীর সুশান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রযত্নই সমধিক আদরণীয়। মণ্ডলী-গঠনকে যুদ্ধকালীন কর্ত্তব্য বলিয়া

মনে করিও না যে, পরিণামের জয়লাভ দ্বারা কর্ত্তব্যের ছোটখাট ত্রুটী ঢাকিয়া দেওয়া যায়। মণ্ডলীগঠন এবং পরিচালন একটী নির্ম্মাণ-কর্ম্ম। ইহাতে ফাঁক, ফাঁকী, চালাকি, চতুরতা, অসরলতা ও কুটিলতা বর্জ্জন করিবে। সংসারের সব কাজেই ত এই সকল ইতর-জন-সুলভ দোষের কিছু না কিছু চর্চ্চা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হইয়া যায়। এগুলিকে অখণ্ড-মণ্ডলীর সুপরিচ্ছন্ন পবিত্র অঙ্গনটীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া পুণ্যানুশীলনের পীঠস্থানটুকুকে নোংরা না করিলে তোমাদের কার কি ক্ষতি হইবে, বল ত!

মানুষের মনকে শুদ্ধ, পবিত্র, পাপের গ্লানি হইতে মুক্ত ও নীচ লালসার ঊর্দ্ধ জগতে বিচরণশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা তোমাদের এক সুমহৎ কর্ত্তব্য এবং মানব-সভ্যতার ইহা বৃহত্তম দায়িত্ব। জীবিকার মান উন্নয়নের নাম সভ্যতা নহে, চরিত্রের মান উন্নয়ন করাই প্রকৃত সভ্যতা। সৌধকিরীটিনী নগরীর সৃষ্টি, বিলাসোপকরণে সুসমৃদ্ধ আপণি ও বিপণি-সমূহের সৃষ্টি, নাট্য-সাহিত্য ও নৃত্য-কলায় অপরূপ প্রতিভার প্রকাশই সভ্যতা-সৃষ্টি নহে, মহামানবোচিত সদ্‌গুণ-সমূহের পরিপুষ্টি বিধায়ক জীবন-যাত্রা-প্রণালীর প্রবর্ত্তনই প্রকৃত সভ্যতার পরিচায়ক। যে সময়ে ইহমুখ স্থূলসত্ত্ব বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা সৃষ্টির নামে শুধু আত্মহননের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর কৌশল-সমূহের আবিষ্কার করিয়া জগদ্ব্যাপী হিংসার খাণ্ডবে দিতেছে ইন্ধন, মিথ্যার তাণ্ডবে করিতেছে নৃত্য, সেই সময়ে জীবনের সর্ব্বস্বের বিনিময়েও তোমাদিগকে একটী, দুইটী, দশটী করিয়া বহু জনের অন্তরে পবিত্রতার স্নিগ্ধ দীপশিখা জ্বালাইবার চেষ্টায় আত্মাহুতি দিতে হইবে।

তোমাদের প্রত্যেকটী প্রচার-চেষ্টার দ্বারা দেশমধ্যে যাহাতে পবিত্র জীবনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাবুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, প্রাণান্ত যত্নে তাহাই

তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে। পবিত্রতা লাভ যে নিজেই একটা পরম প্রাপ্তি, এই কথাটী প্রত্যেকের প্রত্যয়ীভূত হউক। তাহা তোমাদের প্রচারের ফলে যতটুকু হইবে, তাহার শতগুণ হইবে তোমাদের প্রতিজনের জীবনের আচরণ দেখিয়া, তোমাদের উপলব্ধ, উপার্জ্জিত, উপাসিত শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া।—এবং এ সকল আসিবে শান্তিপূর্ণ ব্যক্তিগত নিবিড় উপাসনার ফলে আর ছন্দোবদ্ধ সুষমিত ঐক্যময় সুবিনীত সমবেত উপাসনার নিয়মিত ও ধারাবাহিক সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী অনুশীলনের প্রভাবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৮০
(২৭শে মে, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও। একজনকে যখন একখানা পত্র লিখি, তখন সকলে মনে জানিও যে, প্রত্যেককেই এই পত্র লিখিতেছি।

নিজে কীর্ত্তন-উপাসনা কর বলিয়া পড়াশুনা করিবে না, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। অতি প্রাচীন কালে যাহারা তরুণ বয়সে গুরুগৃহে গিয়া যোগ-যাগ-তপস্যা শিক্ষা করিত, তাহারা কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে

অমনোযোগী হইত না। মধ্যযুগে যাহারা নাম-কীর্ত্তন আদি করিয়া সংসারী জীবনের পাপতাপের ঊর্দ্ধে থাকিবার চেষ্টা করিত, সমাজ তাহাদের অন্ন যোগাইবার ভার নিতে অক্ষম ছিল না বলিয়াই তাহারা বিদ্যার্জ্জনে মন দিত না, কারণ সাধারণ বিদ্যা ত লোকে পেটটা চালাইবার জন্যই অর্জ্জন করে। আজকাল বিদ্যা ও ধর্ম্ম এক সঙ্গে চালাইতে হইবে। তুমি নাম-কীর্ত্তন ভালবাস বলিয়া তোমার বৃদ্ধ পিঁতা তোমার অন্নমুষ্টি অর্জ্জন করিয়া দিবেন, এই প্রত্যাশা পাপ।

নিজে নানা রকমে দেশসেবা কর বলিয়া পড়া-শুনা করিবে না, ইহাও কোনও কাজের কথা নহে। দেশসেবককেও পড়াশুনা করিতে হইবে। বিদ্যার্জ্জনের অভ্যাস হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিলে আস্তে আস্তে মানুষ গাছ-পাথরের ন্যায় হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। শিক্ষা চরিত্রের গুণ্ডামি নাশ করে, শিক্ষা স্তব্ধ হইয়া গেলে গুণ্ডামি অর্থাৎ অর্থহীন ইতরামি চরিত্রের মধ্যে গোয়ার্ত্তুমি লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। সমাজের যত ভাবে পার, যত ইচ্ছা, সেবা কর। বাধা কি? কিন্তু গ্রামের সব মড়া-পোড়াতেই তোমাকে যাইতে হইবে বলিয়া পড়াশুনা গোল্লায় উঠিবে কেন?

কেহ করিবে কীর্ত্তন, কেহ করিবে দেশসেবা, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশটা ছেলেকে পড়াশুনায় অবহেলা করিয়া কীর্ত্তন করিতে বা দেশসেবা করিতে মাতাইয়া তুলিবে, ইহাই যদি অবস্থা হয়, তবে ঐ সব ছেলেদের শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকেরা তোমাকে খারাপ ছেলে বলিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। কেহ তোমাকে খারাপ বলিলে চটিয়া যাইবে কিন্তু যে দোষের জন্য তোমাকে খারাপ বলা হইল, তাহার সংশোধন করিবে না, এইরূপ জিদ ত ভাল নহে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা
১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

চাকুরী কাহারও চিরকাল থাকে না, এক সময়ে না এক সময়ে অবসর নিতেই হয়। সুতরাং প্রত্যেক চাকুরীজীবীর এই একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, হঠাৎ চাকুরী গেলে যেন চক্ষে সরিষাফুল না দেখিতে হয়, তার জন্য বিকল্প একটা আয়ের ব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়িয়া তোলা চাই। ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কোনও একটা ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিলে, জাহাজডুবি ঘটিলেও লাইফ-বোটে চড়িয়া সমুদ্র-লঙ্ঘনের চেষ্টা চলিতে পারে। চাকুরী যতকাল করিয়াছ, একেবারে মগ্ন হইয়াই করিয়াছ। ইহা না হইলে সামান্য একটা পিয়নের চাকুরী হইতে বড় বাবুর পদে উঠিতে পারিতে না। তোমার নিষ্ঠার পুরস্কার তোমার নিয়োগকর্ত্তা যদি না দিতে পারেন, তবে ইহা তাঁহারই দুর্ভাগ্য, এ তাঁহারই দুর্নাম।

কার্য্যকাল আর এক বৎসর বৃদ্ধি করিলে যদি তোমার ভবিষ্যৎ গড়িবার কাজে সহায়তা হইবে বলিয়া মনে কর, তবে কার্য্যকালবৃদ্ধির জন্য সঙ্গত চেষ্টাগুলি সবই করিয়া দেখ। শেষে আর আফশোষ করিয়া কি লাভ হইবে যে, কেন অমুক জায়গায় একটু তদ্বির করিয়া দেখিলাম না, হয়ত ঐ একজনের সহায়তায় আর একটা বৎসর কাজ করিতে পারিতাম। কিন্তু স্থানে স্থানে দরবার করিয়া বেড়াইবার

অসম্মানটায় কাতর হইলে চলিবে না। চাকুরী যাহার চাই, তাহাকে বেহায়া হইতে হয়।

যাহার কাজ ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হইতেছে, তাহার প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ নিয়া ঘরে ফিরিও না। এতকাল ত ঐ একটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই তোমার অন্ন জোগাইয়াছে! তুমি অবশ্য শ্রম করিয়া অর্থ নিয়াছ কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞতা-বোধটা অন্তরে থাকা ভাল। ঐ ব্যক্তি বা ঐ প্রতিষ্ঠানটী না থাকিলে তুমি কাহার চাকুরীটা করিতে? এই বোধটার অভাবহেতু নিজের ভিতরে যে পৈশাচিক অন্তর্জ্জ্বালা ভোগ করিতে হয়, তাহা কিন্তু অবর্ণনীয়। চাকুরী পাওয়াতে আনন্দ আছে, ছাড়িতে বাধ্য হওয়াতে বেদনা আছে। এই আনন্দ আর এই বেদনার কোনটাই যেন তোমার উপরে প্রভুত্ব করিতে না পারে। আশীর্ব্বাদ করি, সবল হৃদয়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাণে ব্যাকুল আগ্রহ জন্মিলে দীক্ষা নিবে। হুজুগে দীক্ষা নিও না। তোমার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা, তবু তোমাকে একটী দিনের জন্যও দীক্ষা গ্রহণের জন্য যে ইঙ্গিতমাত্রও দেই নাই, তাহা তোমার প্রতি

আমার অবহেলা বা তাচ্ছিল্য নহে, তাহা আমার কালপ্রতীক্ষা মাত্র। আমি জোর করিয়া, কৌশল করিয়া, ডাকিয়া আনিয়া বা সাধিয়া কাহাকেও দীক্ষাদান করি না। দীক্ষাপ্রার্থীর ব্যাকুল আগ্রহটী স্পষ্ট হইবার দিনটী পর্য্যন্ত আমি নীরবে প্রতীক্ষা করি।

যখন দীক্ষা নিবে, সম্ভব হইলে বধূমাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। তাহার হাতের সহিতই শুধু তোমার হাত যুক্ত হয় নাই, একটী দিনের একটুখানি ব্যাপারের মধ্য দিয়া মঙ্গলশঙ্খনিনাদিত এক শুভক্ষণে তাহার প্রাণের সহিতও তোমার প্রাণ বাঁধা পড়িয়াছে। এই কারণেই জীবনের প্রতিটি শুভকর্ম্মে সে তোমার সঙ্গিনী থাকিতে অধিকারিণী। এই অধিকার তাহার কখনও পরিত্যাগ বা অস্বীকার করা উচিত নহে।

বধূমাতার ভিন্ন মত, অন্য রকমের জেদ প্রভৃতি আপত্তির আমি অর্থ বুঝি না। স্বামী যদি স্ত্রীকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, তাহা হইলে তাহাকে অনায়াসে নিজ পথে আনিতে পারে। তবে জোর-জবরদস্তি করিয়া একাজটী করিবার প্রয়োজন নাই। ভালবাসা প্রকৃত হইলে, গভীর হইলে আপনা আপনিই এই ঘটনাটি ঘটিয়া যায়। প্রতীক্ষা যত অধিকই করিতে হউক, গায়ের বলে কিছু করিতে যাইও না। প্রাণের টানে আকর্ষণ কর। সদাদর্শ সম্মুখে ধরিয়া তাহার রুচির পরিবর্ত্তন-সাধন কর।

যেই সকল স্ত্রীরা ভিতরে ভিতরে কুলভ্রষ্টা, সদাচারচ্যুতা ও কুসঙ্গপ্রিয়া, অথচ বাহিরে স্বামীর সহিত লোকাচারের সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিয়া সংসার-ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিয়াছে, যদি শক্তিশালী সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পায়, তবে তাহাদেরও সমস্ত গোপন জীবনের মলিন গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের জীবনে নবারুণোদয় সম্ভব হইতে পারে।

দীক্ষার এই অমোঘ শক্তিতে আমি শুধু বিশ্বাসীই নহি, আমি বহু ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষদর্শী।

সংসারের ঘটনাবলি যাহাই হউক, মনকে কদাচ বিপথে চলিতে দিবে না। জীবনের পথে সবল পদবিক্ষেপে চলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে কল্পনাতীত উন্নতি লাভ কর এবং সেই উন্নতির ফলভাক্ কর দেশের সমস্ত দীন, দুঃখী, অশিক্ষিত, অনগ্রসর ও অপটু লোকদিগকে। জীবনের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তুমি যে একা নহ, এই কথাটী বিশ্বাস করিও এবং তোমার অপরিচিত আরও যে কোটি কোটি মানুষ এই পুণ্যময় পন্থাটীরই অনুসরণ করিতেছে, মনে মনে এই আশ্বাস পোষণ করিয়া তাহাদের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হইও। এই প্রেম তোমাকে সবলতা দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জানে প্রাণে খাটিয়া খুটিয়া কোনও প্রকারে একটী মাত্র অনুষ্ঠান সারিয়াই সকলে মিলিয়া চিরকালের মতন চুপ মারিয়া যাইও না। পর পর অবিরাম সপ্তাহের পর সপ্তাহ নূতন নূতন সাফল্যের রেকর্ড সৃষ্টি করিয়া যাইবার জন্য প্রতিজনে বদ্ধপরিকর হও। যে কাজ একটী পল্লীতে করিয়াছ, সে কাজ অধিকতর দক্ষতা সহকারে আরও বহু

পল্লীতে, বহু জনপদে, বহু রাজধানীতে করিতে হইবে এবং করিবে তোমাদের সাংগঠনিক শক্তির অসাধারণ প্রাচুর্য্যের প্রতাপে। উৎসাহ সহকারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কেবল সংগঠন চালাইয়া যাইতে হইবে। ধারাবাহিক সংগঠনের সুফল এক যুগেও নষ্ট হয় না। হঠাৎ হুজুগে মানুষের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য যে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি দেখা যায়, ধারাবাহিক সংগঠনে সেই জিনিষটুকু একটু বিরল। কিন্তু ক্ষণপ্রভার আলো ত' সাময়িক, ধারাবাহিক সংগঠনের ফল চিরন্তন। আরও মনে রাখিও যে, ঐক্য ছাড়া সফল সংগঠন অসম্ভব, ঐক্য ছাড়া মহাশক্তির প্রকাশ ঘটে না, আবার সততা ছাড়া ঐক্য আসে না। কৌশল আর ফন্দিবাজি দিয়া ঐক্য আনয়ন সম্ভব নহে।

প্রতিজ্ঞা কর যে, সহস্র অভাবের মধ্যে থাকিয়াও সৎপথ আশ্রয় করিয়াই চলিবে, বিপথে যাইবে না। সৎপথ আশ্রয় করিবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য ইষ্ট-সাধনে মগ্ন হও এবং সাধন-বলের মধ্য দিয়া ঐক্য অর্জ্জন কর। ঐক্য বক্তৃতার ফলে আসে না, চালাকিতেও না, ষড়যন্ত্রেও না। ঐক্য আসে সততায় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসে।

তুমি পুণ্যার্জ্জনের জন্য গীতাদানের কথা ভাবিতেছ। ভাল কথাই। গীতা সমগ্র পৃথিবীর বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। ইহা দান করিলে নিশ্চয়ই পুণ্য হয়, অবশ্য যদি দানগ্রহীতা ইহা পাঠ করে এবং ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হয়। যে গীতাখানা পড়িল না, তাহাকে দান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যে গীতা বুঝিল না, তাহাকে দান করা গ্রন্থখানার অবমাননা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা আসে। গীতা অর্জ্জুনের গুরুবাক্য। যে নিজেকে অর্জ্জুনের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে মনে ভাবে, ইহা তাহার পক্ষেও গুরুবাক্য। কিন্তু তোমার পক্ষে তোমার গুরুবাক্য কি কোনও

২

উপদেশ-সংগ্রহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই? অখণ্ড-সংহিতা কি তোমারই গুরুর বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি নহে? অখণ্ড-সংহিতা কি তাহার পক্ষে অবোধগম্য, যাহাকে তুমি ইহা হয়ত উপহার দিলে দিতে পার; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চাহি না। কিন্তু তোমার গুরুবাক্য তোমার পক্ষে বোধগম্য, তোমার দান-গ্রহীতার পক্ষেও বোধগম্য, তথাপি ইহা অন্যকে দান করিতে তোমাদের রুচি হয় না। কেন হয় না বলিতে পার? তোমরা নিজেরা নিজেদের গুরুর বাক্য পাঠ কর না বলিয়া। দীক্ষাই একটা নিয়াছ, কাজ কিছুই করিতেছ না। একজনকে গুরু বলিয়া একদিন হঠাৎ ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিয়া মনে হয় যেন তোমাদের অফুরন্ত আফশোষ আসিয়া গিয়াছে। এজন্য যখন যে কাজটুকু করিবার, কেবল হুজুগের প্ররোচনা পাইলেই কর, মনের ধীর স্থির অচঞ্চল শুভবুদ্ধির প্রেরণায় কিছু কর না। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিয়া রাখিতেছি যে, তোমার পক্ষে একশত খানা গীতা দান করিলে যে ফল, পাঁচ খানা অখণ্ড-সংহিতা দান করিলে তার চেয়ে বেশী ফল। কারণ, ইহা তোমার গুরুবাক্য। গুরুবাক্যে আস্থা বর্দ্ধনের জন্যও শিষ্যের পক্ষে গুরুবাক্য প্রচার করা লাভজনক। গুরুবাক্য প্রচার করিতে যাইয়া গুরুবাক্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইয়া যায়, ইহাতে সত্য সত্য সদ্বাক্যের শুভফল অধিকাধিক সংখ্যার লোকে প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, শিষ্যই নিজের দাঁড়াইবার পাদপীঠটুকুকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে। যাহা কিছু বিলাইবে, তাহাই সমাদৃত হইবে না, একমাত্র সত্যই সমাদৃত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮০
(১লা জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিই সমদীক্ষিত। ইহা একটা বিশেষ আনন্দজনক সংবাদ। কারণ, তোমাদের সকলের মনে আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক্ দিয়া সমভাবেরই অনুশীলন চলিতে থাকিবে। ইহার স্বাভাবিক ফল বংশানুক্রমে ধারাবাহিক চর্চ্চা। ইহার অপর ফল পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট ও অনুকূল করা। শিশুরা বড় হউক, তারপরে স্বকীয় স্বাধীন ধর্ম্মীয় রুচি সৃষ্টি করিয়া লইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎ কল্পনা নিয়া কেহ নিজ নিজ শিশুদিগকে তোমাদের আহৃত অমৃত হইতে বঞ্চিত রাখিও না। পরিবার ও পরিজনদের সকলের মধ্যে একই ভাবের আধ্যাত্মিক চর্চ্চা প্রসারিত করিয়া দিয়া সকলে মিলিয়া একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্বে পরিণত হইয়া যাইবার চেষ্টা কর। তোমাদের চরম লক্ষ্য বিশ্বের সকলকে এক-পরিবারভুক্ত রূপে পাওয়া। নিজেদের ক্ষুদ্র পরিবারটী দিয়া তাহার কর্ম্মসূচনা শুভপ্রদ হইবে।

জাপানে একই পরিবারে নাকি একজন হয়ত খ্রীষ্টান, অপর জন বৌদ্ধ, তৃতীয় জন মুসলমান। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মত-পথে এরূপ বিভিন্নতা থাকিলে তাহাদিগকে ঐক্যানুশীলন করিতে হয় স্বাদেশিকতার মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ জাপানীদের স্বদেশপ্রেম এক অতুলনীয় বস্তু। তাহাদের স্বদেশপ্রেম বজ্রদৃঢ় ও নিশ্চয়াত্মক

আদর্শের বলে বলীয়ান্ বলিয়া ধর্মভেদের দরুণ মনোভেদের ও মনোভঙ্গের কারণ নাকি ঘটিতে পারে না। এই দৃষ্টান্তটী সত্য হইলে সমগ্র পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরই জাপানী সজ্জনদের চরিত্র ও আচরণ হইতে যথেষ্ট শিক্ষা করিবার জিনিষ আছে।

মুসলমানদের সকলেই একেশ্বরবাদী, তাঁহাদের মধ্যে বহু-পূজা নাই, এই জন্যও যে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবল বেশী, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। একের উপাসকেরা কতকগুলি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হইবার সহজ সুযোগ পায় বলিয়া ঐক্যবলে যে যে সৌভাগ্য জয় করিবার অধিকার মানুষের আছে, তাহা তাহারা নিশ্চয়ই পাইয়াছে এবং পাইবে। হিন্দুর সংস্কারে একই পরিবারে বত্রিশ দেবতার সিংহাসন, এক ব্যক্তির জন্য দ্বাদশটী পূজা-বিগ্রহের প্রয়োজন, একই প্রয়োজনে তিন চারি পাঁচটী দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন। এমত অবস্থায় কেহ কদাচ আশা করিতে পারে না যে, ধর্ম্মীয় ব্যাপারে হিন্দু কখনো সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে। এক দেবতার পূজকেরা অপর দেবতার পূজকদের সহিত যদি দিলখোলা ভাব জমাইতে না পারে, তবে উপাসকদিগকে দোষ না দিয়া সেই দোষ বহু বহু উপাস্যের স্কন্ধে চাপাইতে হয়।—এগুলি অনেকের নিকটে বিষম চিন্তার বিষয়, এবং গুরুতর সমস্যার ব্যাপার।

তোমরা একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহকে সম্বল করিয়াছ, ইহার ভিতরেই সর্ব্বদেবতার উপস্থিতি অনুভব করিতে তোমাদের ক্লেশ নাই। তোমরা যদি প্রত্যেকে অকপটে নিজ নিজ সাধন-কর্ম্ম নিয়মিত করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে বিনা চেষ্টায় তোমাদের মধ্যে স্বাভাবিক এক ঐক্যবোধে জাগৃতি অবশ্যম্ভাবী। ঐ ঐক্যবোধ একবার যদি নিজ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আসিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ঐক্যবোধ

সমগ্র শহরে যাবতীয় সমদীক্ষিতের প্রতি আসিতে পারে। এরূপ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলিয়া আমি মনে করি। অবশ্য, বিশ্বের সকল মানুষকে তোমাদের মতাবলম্বী ও পথানুসরণকারী করিবার জন্য প্রয়াসে তোমরা প্রমত্ত হও, ইহা আমি চাহি না, কারণ, বিশ্বের সমস্ত মানুষ কখনই একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হইবে না, তাহাদের মধ্যে বিচিত্রতা থাকিবেই। বিধাতাই মানুষকে তেমন বিচিত্র রুচি, বিচিত্র প্রকৃতি ও বিচিত্র জন্মভূমি দান করিয়াছেন। কিন্তু, তোমরা যদি নিজ সাধনে অকপট নিষ্ঠা নিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাক, তবে স্বভাবতই শত, সহস্র, কোটি মানব-মানবী নিজেদের প্রাণেরই আগ্রহে, নিজেদের ভালবাসারই তাগিদে তোমাদের পথের পানে ছুটিয়া আসিবে। তাহাদিগকে তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি, শান্তির বিশ্রাম, ক্লান্তির তৃপ্তি দান করিবার জন্য কেন তোমরা অখণ্ড-সাধনার অমৃত-ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া আগাইয়া যাইবে না? যাহারা চাহে, চাহিতে বাধ্য, তাহাদিগকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিতেই হইবে। এই জন্যও তোমাদের পরিবারস্থ প্রত্যেককে একমুখী মন, একলক্ষ্য প্রাণ নিয়া সাধন করিতে হইবে। অকপটে সাধন করিলে দেখিতে পাইবে যে, তোমরা আর একাচোরা ভাব নিয়া থাকিতে পারিতেছ না, বাহিরের বিশ্বের হাজার মানুষকে তোমাদের সঙ্গে পাওয়ার প্রয়োজন। কেননা, মূলতঃ তোমার সাধনা ত জগন্মঙ্গলের সাধনা। নানা জনে নানা জনকে ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনার পথ বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা যে পাইয়াছ জগন্মঙ্গলের পরমকল্যাণময় সংসঙ্কল্প। তোমাদের মুক্তি তোমাদের একার জন্য নয়, তোমাদের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সবই এই সঙ্কল্প-মাধ্যমে জগন্মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হইতেছে প্রতিদিন নামজপের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে। তোমরা একা থাক কি করিয়া?

সুতরাং সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশিবার এবং সমাজসেবা করিবার প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই আসে। মনে যখন তোমাদের সমাজসেবার আগ্রহ জন্মিয়াছে, তখন, সাধনে মন অবিচলিত রাখিলে, সে সুযোগ তোমাদের নিশ্চয়ই আসিয়া যাইবে। প্রথম প্রথম ছোট ছোট সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে পরে আপনা আপনিই বড় বড় সুযোগ আসে। প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক সঙ্কীর্ণের চাপের একটু স্পর্শ যদি আমার করিতে পায়, তবে ছোট্ট কাজটীও একটী বিরাট কাজে পরিণত হয়। একার কাজ অধিকাংশ সময়ে সাময়িক কাজই থাকিয়া যায়। বহু জনের সম্মিলিত কাজ সাময়িক হুজুগে প্রণোদিত হইলেও কখনো কখনো বহুদূরবিস্তীর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, কখনো কখনো বহুযুগব্যাপী ভবিষ্যতের সূচীপত্র-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সাধারণ একটী কাজেও বহুকে এক মিলাইবার প্রয়াসকে এক মহাযজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

সকলের সর্ব্বশক্তি একত্র করার নাম সংগঠন। প্রতিজনের শক্তির সাধ্যানুযায়ী ব্যবহারে আনার নাম সংগঠন। প্রতিটী কুটীরে প্রতিটী মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টার নাম সংগঠন। পৃথিবীময় সকল লোককে আপন করিয়া লইবার ধারাবাহিক সাধনার নাম সংগঠন।

সংগঠন-কার্য্য হইতে তোমরা ফাঁকিকে দূরে রাখিবে। কাজে তোমাদের কোনো ভাণ থাকিবে না। সকলে সরল মনে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা দিবে। সংগঠন-কাজের মাঝখানে আত্মস্পর্দ্ধা এবং কলহকে প্রবেশ করিতে দিবে না। যেটুকু কাজ যখন করিবে, একমন একপ্রাণ হইয়া করিবে। তোমরা যদি সত্যে ও সততায় অবিচল হও, তোমরা যদি সাহসে ও নিষ্ঠায় সুদৃঢ় থাক, তোমাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যদি অপরাজেয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রতিজনকে দিয়া জগৎ গৌরব বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে সমগ্র মানব-জাতির।

নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনের কালে, জানিও, আমি তোমাদের সমসাধক নহি। আমি তোমাদের নিত্যদাখী। তখন আমার আসন তোমাদেরই দেহমধ্যে, হয় ভ্রূমধ্যে, নয় হৃৎকমলে। জ্ঞানময় ভাবে ভ্রূমধ্য, প্রেমময় ভাবে হৃৎকমল প্রসিদ্ধ। তখন আমার বসিবার জন্য তোমার দেহই আমার আসন, আলাদা আসন প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু সমবেত-উপাসনা-কালে আমি তোমাদের সমসাধক, তখন তোমাদের কণ্ঠের সঙ্গে আমার কণ্ঠ স্তোত্রোচ্চারণ করে, তোমাদের ব্রহ্মগায়ত্রী-গানের কালে আমিও "তৎসবিতু" বলি, আমিও "ধীমহি" করি। তোমাদের জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের কালে আমিও নিজের জন্য নির্দিষ্ট সম্মুখবর্ত্তী আসনটীতে সূক্ষ্মদেহে বসিয়া নিজেকে জগতের মঙ্গলের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মনে মনে বারংবার ঐ একই সঙ্কল্প করিয়া যাইতে থাকি। যতকাল সমবেত উপাসনার প্রচলন পৃথিবীতে থাকিবে, ততকাল আমি বিদেহী সত্তায় তোমাদের সমসাধক রূপে এ কাজটী করিয়া যাইতে থাকিব।

আমার কুশল জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ? আমার পার্থিব দেহের পতন হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিত হইয়া গিয়াছে? যাউক না। এখনো সশরীরে বর্ত্তমান আছি, চিন্তার কারণ নাই। আমার মৃত্যু-সংবাদ গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এতবার রটনা হইয়াছে যে, কি বলিব। রটনাকারীরা দীর্ঘজীবী হউন। তোমরা সকলে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নামের সাধন করিতে থাক।

তোমাদের অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণে নানা ধর্ম্মীয় গোষ্ঠী নিজ নিজ ভক্তদের নিয়া অনুরূপ সদনুষ্ঠান করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহাতে তোমাদেরই মর্য্যাদা বাড়িতেছে। তবে, মনে রাখিও যে, তোমাদের অনুষ্ঠানগুলি তোমাদিগকে ধারাবাহিকতার শক্তিতে বহু

বৎসর পর্য্যন্ত অবিচলিত বিক্রমে চালাইতে হইবে। পাঠ, কীর্ত্তন, সমবেত উপাসনার জোয়ারে যেন কখনো ভাটা না পড়িতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * তোমাদের নৈনানপাড়া পল্লীর শ্রীমতী স্নেহলতা দাসের লিখিত সংস্কৃত বন্দনা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। লেখাপড়া জানে না, তবু রচনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। ইহাতে ব্যাকরণের ভুল আছে কিন্তু তাহার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহাকে আমার স্নেহ, প্রশংসা ও শুভাশীর্ব্বাদ জানাইও।

ধর্ম্মীয় ব্যাপারের মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভারতের সর্ব্বপ্রান্তের হিন্দুদের মধ্যে অল্পাধিক পরিচিত ভাষা। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য হেতু সংস্কৃত আমাদের কাছে আরও অধিক পরিচিত বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ভাষাগুলি একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে, ইহারই ফলে আস্তে আস্তে সমগ্র ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় এক অসাধারণ মহিমামণ্ডিত সর্ব্বজনীন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই দিকে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি নাই, হয়ত অধিকাংশ মনীষীরও লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভারতপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই এই

সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন ভাষাটির প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আমাদের উপাসনার মন্ত্রগুলি ত' সবই সংস্কৃতে,—অবশ্য সহজ সংস্কৃতে। যতকাল ভারতে ধর্ম্ম নামক বস্তু থাকিবে, ততকাল সংস্কৃতের মৃত্যু নাই,—অবশ্য, ক্ষমতাধিকারীদের সুদৃষ্টি সংস্কৃতের উপরে থাকুক আর না থাকুক। তোমরা ধৈর্য্য না হারাইয়া, সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম-বাহু বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়া, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতে থাক। সংস্কৃত সত্যই যে খুব কঠিন ভাষা নহে, তাহা অভ্যাস করিতে করিতেই প্রমাণ পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮০

(৫ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পল্লীবাসী যুবকের কাছ হইতে এরূপ পত্র পাইলে যে-কোনও সৎ-প্রতিষ্ঠান বা আশ্রমের কর্তৃপক্ষের আনন্দ হওয়ার কথা। কারণ, এই যুগে সব তরুণেরা কেবল চাকুরী খোঁজে, জনসমাজের সেবা করিবার জন্য কোনও আশ্রমে আসিবে সেবক রূপে, এমন কল্পনা অধিকাংশেরই নাই। ১৯১৪ আর ১৯৪২ এর দুইটা

বিরাট বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলায় তথা ভারতের যুবকদের মধ্য হইতে ত্যাগের স্পৃহা নিদারুণ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সবাই চায় উপার্জ্জন করিতে, কাহাকেও সেবা দিতে কেহ চাহে না। যে-কোনও আশ্রমে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিও, প্রবীণ কর্ম্মীরা নবীন সহকর্ম্মীদের অনাগমনের দরুণ হতাশায় হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। নবীন যাহারা আসে, তাহারাও দুই চারি মাস বা দুই চারি বৎসর পরে ছল ছুতানাতা ধরিয়া সুকৌশলে সরিয়া পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাব্যক্তিরা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন যে, কি করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান চলিবে। শুধু টাকার জোরেই প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না, মানুষেরও ত' প্রয়োজন। তাঁহারা মানুষ পাইতেছেন না বলিয়া অনেকে দিশাহারা হইয়া যাইতেছেন। আবার, মানুষও ত চাই কৃতবিদ্য, শিক্ষিত, কর্ম্মপটু, স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং চরিত্রবান্।

তোমার ত' বাবা দুদিকেই অসুবিধা। একদিকে ঘরে বৃদ্ধা বিধবা মাতা আছেন, তাঁহার সেবা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। বড় ভাই একটী আছেন বলিয়াই তাঁর একার ঘাড়ে মাকে ফেলিয়া আসিতে পার না। অন্য অসুবিধা, তুমি ত অশিক্ষিত। ক্লাস থ্রি র বিদ্যা নিয়া আশ্রমে আসিয়া তুমি কোন্ বিশেষ জরুরী কাজটার পক্ষে উপযুক্ত হইবে বল! অনেক দিন লাগিয়া থাকিলে ট্রাক্‌টার চালানো বিদ্যাটা হয়ত তোমাকে শিখাইয়া দিতে পারিব, কিন্তু বিহার-সরকার ভূমির সীমা-নির্দ্ধারক আইনটীকে যে পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের হয়ত ট্রাক্‌টার চালাইবার জমি কদাচ থাকিবে না, যাহার ফলে ট্রাক্‌টার বিক্রী করিয়া ফেলিয়া হয়ত আপদ চুকাইতে হইবে। শুধু কোদাল মারা, খন্তা মারা, শাবল মারা কাজ করিয়া কি আশ্রমে তোমার প্রাণে শান্তি

মিলিবে? আশ্রমে আসিয়া নিশ্চিন্ত অন্ন পাইবার পরে অন্যান্য অলস অকর্ম্মণ্যদের দেখাদেখি তোমারও ঘুমাইয়া ঝিমাইয়া কাল কাটাইবার লুব্ধতা জাগিবে। পুপুন্‌কীতে ত প্রেমাঞ্জন সারাদিন এই অলসগুলিকে ঠেলাইতেই দিন কাবার করিয়া দেয়, অন্য কোনও মহত্তর কাজে এই দামী কর্ম্মীটি মনোনিবেশই করিতে পারে না। এই কারণে আশ্রমে অশিক্ষিত কর্ম্মীর আগমন আমরা বাঞ্ছা করিতে সাহস পাই না। আয়ুর্ব্বেদের বা প্রেসের কাজ শিখিবার জন্য যাহাদিগকে বারাণসী আশ্রমে পাঠাই, দুই চারিদিনের মধ্যে ক্লান্ত হইয়া তাহারা ঘরে ফিরিয়া যায়। এই সকল কুদৃষ্টান্ত বড়ই ক্লান্তিকর ও বিরক্তিজনক। সুতরাং তোমাকে আসিতে নির্দ্দেশ দিব কি করিয়া বল!

তথাপি যদি মনে কর যে, আশ্রম-বাসের সুখ-দুঃখটা একবার আস্বাদন করিয়া দেখাই চাই, তাহা হইলে সাময়িক পাঁচ ছয় মাস কাল আশ্রমে বাস করিবার পরে গৃহে ফিরিয়া যাইবে, এই সঙ্কল্প নিয়া আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে পুপুন্‌কী আশ্রমে চলিয়া আসিও। দলে দলে কর্ম্মীকে বিছানা-মশারি, কম্বল-সতরঞ্জি দিতে দিতে আমরা হদ্দ হইয়া গিয়াছি, সুতরাং এগুলি আমরা দিব না জানিয়া নিজেদের বিছানা-পত্র নিজেরা নিয়া আসিও। ভোরে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে, হস্ত-পদ-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া হরিনাম করিতে হইবে, সকলের সঙ্গে গো-দোহন, হলকর্ষণ, কৃষি-রোপণাদি কাজ করিতে হইবে, পুনরায় সান্ধ্য উপাসনা সারিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইতে হইবে, আশ্রমের জিনিষপত্রকে নিজের ঘরের সম্পদ জানিয়া চোরের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে এবং মানুষের সহিত আচরণে সৎ থাকিতে হইবে।

এইরূপ জীবন-যাপন যদি পছন্দের হয়, তবে মায়ের অনুমতি এবং পদধূলি নিয়া নিজ সুবিধামতন রওনা হইবে। পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরমেশ্বরের হাতে। * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকন্যার পিতামাতারা সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করেন যে, পুত্রকন্যা এমন হউক যেন তাহাদের জন্য গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করা যায়। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গুরুও তেমন সর্ব্বদা এই কামনাই করেন যে, শিষ্যশিষ্যা এমন হউক যেন তাহাদের দ্বারা সমগ্র জগদ্‌বাসী লাভবান ও গৌরবান্বিত হয়।

তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে আমার সেই কামনাটী পূরণ করিয়াছ। তোমার স্বামী মদ্যপানের নেশা পরিত্যাগ করিয়া একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ জীবন-যাপন সুরু করিয়াছে, ইহাতে কেবল তাহার কিম্বা তোমারই লাভ নহে, সমগ্র সমাজের প্রতিটী প্রাণীর পক্ষে এইজন্য লাভ যে, প্রত্যেকে এখন হইতে বিশ্বাস করিবে যে, ঘোর-নেশাসক্ত

---

* এই যুবকটী পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়াছিল এবং তিন চারিদিন থাকিবার পরেই চলিয়া গিয়াছে।

অন্ধ মাদকীর পক্ষেও নেশার রাহুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং নির্ঝঞ্ঝাট সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের সেবামূলক পুণ্যময় কর্ম্মসমূহ সম্পাদনে ব্রতী হওয়া সুসাধ্য। তোমার স্বামী একটী মাত্র সৎকীর্ত্তি দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল করিলেন,—সেই সৎকীর্ত্তি তাঁর নেশার দাসত্ব ত্যাগ।

এই ব্যাপারে, একটু প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া, আর কোনো কৃতিত্ব আমার নাই। তুমি তোমার উচ্চ আদর্শবাদের দ্বারা স্বামীর মনে কল্যাণের রেখাপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছ। এজন্য কৃতিত্বের দাবী তুমি করিতে পার। তোমার গুরুভ্রাতা শ্রীমান সু—প্রতিনিয়ত তোমার স্বামীকে সৎপরামর্শ দিয়া দিয়া তাহাকে মদ্যপানের আসক্তি বর্জ্জন করিতে সাহায্য করিয়াছে,—এজন্য কৃতিত্বের দাবী সেও করিতে পারে। যাহারা মদ্যপান করে না এবং সুরাপান ব্যতীতই কঠোর-শ্রমসাধ্য কাজ-কর্ম্ম করিয়া নিজ নিজ জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছে, চারিদিকে তাহাদের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তগুলিও তোমার স্বামীকে পরোক্ষে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছে। এজন্য কৃতিত্বের দাবী তাহারাও করিতে পারে। কিন্তু কেহই এই ব্যাপারে নিজ নিজ দাবী নিয়া অগ্রসর না হইয়া সবটাই আমার কৃপা বলিয়া যে ব্যাখ্যা দিতেছ, তাহাতে আমি কৌতুক বোধ করিতেছি। কৃপা পরমেশ্বরের। এই কৃপা চিরস্থায়িনী হউক।

আর একটী অসাধ্য-সাধন তুমি করিয়াছ, চারি বৎসর কাল ধারাবাহিক ভাবে দাম্পত্য সংযম পালন। মন নিরহঙ্কার থাকিলে এই অসিধারা ব্রতে দম্পতী সফল হইতে পারে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের হাতে নিজের দেহ ও মনকে নিঃসর্ত্তে দান করিয়া দিলে তবে এই ব্রতে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়। দেহের প্রতিটি পরমাণু পরমেশ্বরকে দিয়া জীবনের

পথ চলিলে একটী পদক্ষেপও কদাচ ভুল হয় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হইতে প্রেম জন্মে এবং প্রেম আসিলে কাম নিঃশেষে পলায়ন করে। পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, প্রেমিক হও।

দুর্গম পথকে অগ্রাহ্য করিয়া দূর-দূরান্তরের পাহাড়ী বস্তিগুলিতে পর্য্যন্ত নিজ নবজাত শিশু সন্তানকে স্বামীর হেফাজতে রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া যাও বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের সঙ্গে বসিয়া সমবেত উপাসনা করিতে বা কোথাও অখণ্ডমতে একটী বিবাহ দিতে বা কোথাও একটী অখণ্ডমতের শ্রাদ্ধ-কার্য্যকে সুসম্পন্ন করিতে,—এ সকল কথা বিস্তারিত জানিবার পরে তোমার জন্য আমি অন্তরে গৌরব অনুভব করিতেছি। অধিকতর আহ্লাদ অনুভব করিতেছি শ্রীমান সু—র মাতা শ্রীমতী নীলু বালা দেবীর এই পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বার্দ্ধক্য-দশায়ও প্রতি স্থানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মত্ত হস্তীর উৎসাহ নিয়া প্রতিটী কার্য্যে সহায়তা প্রদান করার সংবাদ শুনিয়া। শ্রীমান সু—র গাড়ী নিয়াই তোমরা দূরদূরান্তরে ছুটিয়া যাও, শুনিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রার্থনা করিতেছি, যাহাদের গাড়ী ও ধনসম্পদ সর্ব্বজনের কল্যাণকর কর্ম্মে নিরত নিয়োজিত হয়, তুমি তাহাদের গাড়ী ও সম্পদ বর্দ্ধিত কর। পাহাড় অঞ্চলে কাজ করিবার কালে আমি ত সর্ব্বদাই তাহার গাড়ী ও ট্রাক পাইয়াছিই, সে তাহার নিজের হাজার কাজের ক্ষতি করিয়াও যে তোমাদের কাজ করিবার সময়ে অকাতরে সব সহায়তা করিতেছে, ইহা বড়ই গৌরবের। তাহার মাতার দৃষ্টান্তই তাহাকে নিয়ত অনুপ্রাণিত করিতেছে, সন্দেহ নাই। ইহারা ধন্য।

চারিদিকে পাহাড়-পর্ব্বতগুলিতে প্রেমের আগুন ধরাইয়া দাও। আমাদের প্রেমের শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-চপলতার স্থান নাই। আমাদের

প্রেমের শাস্ত্রে ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের প্রশ্রয় নাই। আমাদের প্রেমের শাস্ত্রে নারীপুরুষের অসামাজিক মিলন নাই। আমাদের প্রেমের শাস্ত্রে একমাত্র স্বামী এবং পত্নী ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ-নারীর মধ্যে দৈহিক ঘনিষ্ঠতার কোনও সুযোগ নাই। আমাদের প্রেমের শাস্ত্র সুপরিচ্ছন্ন চরিত্র-সাধনার শাস্ত্র। এই একটী কথা মনে রাখিয়া এবং এই একটা কথা সর্ব্বত্র সকলকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়া কাজ করিবে। অতীতে তোমরা যতখানি বেগে কাজ করিয়াছ, অদূর ভবিষ্যতে তার শতগুণ বেগে তোমাদের কাজে নামিতে হইবে। তখন ঝোঁকের মুখে অনেক প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিতে মনে থাকিবে না। এই জন্যই আমি বৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের প্রাক্-মুখে এই অতীব প্রয়োজনীয় কথাটী তোমাকে বলিয়া রাখিলাম। শ্রীমতী নীলুবালার নেত্রীত্বে তুমি যান-বাহনের দ্বারা গমন-সাধ্য সমস্ত পাহাড় অঞ্চলে প্রত্যেকটী টিলা-টঙ্কর লাঙ্গলের ফালে চষিয়া ফেল না। প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া অখণ্ড-মহিলা-সমিতির উদ্‌ঘাটন কর এবং আমাদের সংযম-সুন্দর সর্ব্বজনসুখকর অনবদ্য আদর্শকে প্রতিটি বঙ্গভাষী ও পার্ব্বত্য ভাষাভাষী নারীর অন্তরে সুখ-প্রবিষ্ট করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২২ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বৃদ্ধামাতা নীলুবালার কার্য্যকলাপের বিবরণ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীমতী রে—যৌবনবতী মহিলা, সংগঠন-কার্য্যে তাহার কর্ম্মোৎসাহের ব্যাপার কতকটা স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে, যদিও তজ্জন্য তাহার প্রাপ্য প্রশংসাকে কম করিয়া দিতে আমি পারি না কিন্তু তোমার পঁচাত্তর-বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা কি করিয়া নবযুবতীদের সহিত পাল্লা দিয়া দূরদূরান্তরে পাহাড়ী বস্তিগুলিতে সংগঠন-কার্য্য করিতে যাইতেছেন, ইহা ভাবিয়া অবাক্ লাগিতেছে। মনে হইল আবার বুঝি বাঙ্গালীর সমাজ-দেহে বিস্মৃত এক পুরাতন কালের নব-যৌবন-জাগরণ ফিরিয়া আসিল, যেই সময়ে আকাশের দিকে তাকাইলে এক সঙ্গে শত জ্যোতিষ্কের আলোক দেখা যাইত। তোমার মায়ের সঙ্গে তুলনীয় একটী মাত্র নাম এখন আমার মনে পড়িতেছে, শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা রায়, আগরতলা জয়নগরের তারাভূষণ রায়ের বৃদ্ধামাতা। বয়স আশির উর্দ্ধে। কিন্তু প্রত্যেকটী নগর-সঙ্কীর্ত্তনে আগরতলা হইতে অরুন্ধতীনগর অঞ্চলের চারি মাইল ব্যাপী সমগ্র স্থানটী একটী হরিওঁ পতাকা হাতে নিয়া পদব্রজে পরিক্রমা করিবেনই করিবেন, কাহারও বাধা মানিবেন না।

একটী যুবতী এবং একটী বৃদ্ধা,—এই দুইটী মহিলা যখন মন-প্রাণ এক সূত্রে গাঁথিয়া লইয়াছেন এবং তোমার যখন দুই তিনখানা গাড়ী বা ট্রাক ভগবানের দয়ায় হইয়াছে, তখন কুমারঘাট হইতে ডলুবাড়ী পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানটুকুর যাবতীয় টিলা-টঙ্কর চষিয়া ফেলিয়া সমতল করিয়া দিবার সঙ্কল্পে আরূঢ় হও এবং পারিলে উত্তরের ও দক্ষিণের মণ্ডলীগুলির সর্ব্বশক্তি একত্র নিয়োজিত করিবার চেষ্টা কর। সকলে মিলিয়া কোনও স্থানে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিবার অনুশীলন বা রুচি এই

হতচ্ছাড়া বাঙ্গালী জাতিটার মধ্যে এতই কমিয়া গিয়াছে এবং একা একা দেশোদ্ধারের উদ্ভট আগ্রহ প্রতিস্থানে এমন শোচনীয় ভাবেই পরিস্ফীত হইয়াছে যে, আমার এই প্রয়োজনীয় উপদেশটুকু তোমরা পালন করিতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সুপ্রচুর সন্দিগ্ধতা থাকিলেও আমি এই চেষ্টাটী আগে করিয়া দেখিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। তোমার জেলার সদরে বসিয়া শ্রীমান্ শশাঙ্ক একটী সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া শবরীর প্রতীক্ষার শক্তি লইয়া একটী পদ্ধতিবদ্ধ কার্য্যক্রম ধারাবাহিক ভাবে পরিচালন করিয়া আসিতেছে। এই পত্র সহ তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহার প্রকৃত পরিকল্পনাটী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হও এবং তদনুযায়ী একই লক্ষ্য লইয়া কাজে নামো। কর্ম্মী তোমার কম কিন্তু ইহারা খাঁটি। অঞ্চল তোমার অনগ্রসর কিন্তু এখানে অল্প চাষে বেশী ফসল আসে। প্রত্যেকটী অখণ্ডকে কর্ম্মের মাদকতায় প্রমত্ত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০
(১৪ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার নাম সংযুক্ত করিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছ এবং জনশিক্ষার অধিকর্ত্তার নিকট হইতে অনুমোদন পাইয়াছ, শুনিয়া যুগপৎ

হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইলাম। হর্ষ এই জন্য যে, তোমরা শিক্ষা জগতে কিছু সেবা দানের জন্য আগ্রহী হইয়া কাজে নামিয়াছ। বিষাদ এই জন্য যে, বিদ্যালয়ের গায়ে আমার নামটা আঁটিয়া দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, তোমরা নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ করিয়াছ। আমি সমগ্র জীবন ভরিয়া যে চিন্তাগুলি করিয়া আসিয়াছি, সেই চিন্তাগুলির সহিত যদি তোমরা তোমাদের ছাত্রদের মনকে পরিচিত করিয়া দিতে পার, তবেই ত' আসল কাজ হইল।

তোমাদের শহরটার উপর দিয়াই যে গ্রামটীতে আমার কিছুকাল পরে যাইবার কথা হইতেছে এবং যেই গ্রামটীর অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠা, ধৈর্য্য এবং বিশ্বাসের সহিত সাংগঠনিক কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের ওখানে যাইবার সময়ে দুইটী ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম করিয়া তোমাদের শহরের ব্যাকুল দীক্ষার্থীদের যেন দীক্ষা দিয়া যাই বলিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছ। এই অনুরোধ রক্ষা করা যাইতে পারে, তবে দুইটী আপত্তির কথা আছে। এক স্থানে কাজ করিতে যাইবার পথে কোথাও আবার দীক্ষার হিড়িক রাখিলে বিশ্রামটা কিরূপ হয় বল ত! বিশ্রাম হয় না বরং অন্য স্থানে গিয়া যোগ্য ভাবে কাজ করিবার শক্তি কতকটা পথমধ্যে অপচরিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কেহ দীক্ষা চাহিলেই সঙ্গে সঙ্গে দিয়া দেওয়ার কুফল চারিদিকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিনা ক্লেশে মহামূল্য সম্পদ লাভ করিবার ফলে এই সম্পদের যোগ্য সমাদর অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং তোমাদিগকে বন খুঁজিয়া খুঁজিয়া চন্দন-তরু বাহির করিতে হইবে। মাদার কাঠে মরা পোড়াও ভাল ভাবে হয় না। সুপাত্রেরা আসিয়া দীক্ষা নিবে, তবে ত' দীক্ষার সদ্ব্যবহার হইবে! দীক্ষা পাওয়াটাকে

নবজীবনের উন্মেষ বলিয়া মানিতে পারিবে, তেমন ব্যক্তি ছাড়া অন্যকে দীক্ষা দেওয়াই অন্যায়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলিকে আমার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার দিকে তোমরা মন দাও। এই কাজটী নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করিবার উপায় আবিষ্কারে তোমরা চেষ্টিত হও। আমার নামাঙ্কিত একশতটী বিদ্যালয় স্থাপনের চেয়ে যে-কোনও নামে পরিচিত যে-কোন ও একটী বিদ্যালয়ের সবগুলি ছাত্র বা ছাত্রীকে আমার জগৎকল্যাণমূলক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে পারিলে তোমরা ঢের বেশী কাজ করিলে বলিয়া মনে করিও। ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্জ্জগতে তোমরা প্রবেশ কর, তাহাদের মনের অন্ধকার কোণগুলিতে তোমরা জ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ কর, তাহাদের উদাস, অবশ, ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীন নিরুদ্যম মনগুলিতে তোমরা উৎসাহের নবসঞ্জীবনা সৃষ্টি কর। এটী তোমাদের অতি প্রধান কাজ। এটী তোমাদের আসল কাজ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮০
(১৫ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সুন্দর মনোভাব নিয়া বারাণসী আশ্রমে গিয়াছিলে, তাই একমাস-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পরেও প্রচুর আনন্দ নিয়া ঘরে ফিরিয়াছ। যার

যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। অনেককে ত দেখিয়াছি, ওখানকার কাজ দেখিয়া "বাপ্‌রে বাপ্‌" বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। সেবার ভাব নিয়া যাহারা গিয়াছে, কেবল তাহারাই বারাণসী বা পুপুন্‌কী হইতে তোমার মতন প্রচুর আনন্দ নিয়া ফিরিতে পারিয়াছে। ফাঁকতালে যাহারা আশ্রমের খরচে নিজেদের স্বাস্থ্যটী বাগাইয়া লইতে গিয়াছে, তাহারা স্বাস্থ্যটী ফিরিয়া পাইয়াছে ঠিকই কিন্তু আশ্রমের অন্তর্নিহিত মহিমার কিছুই বুঝিয়া আসিতে পারে নাই।

ঈশ্বরে মন রাখিয়া নিয়ত কাজ করাই বারাণসী আশ্রমের আবহাওয়া। তোমার এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল। কর্ম্মকে ব্রহ্ম জানিয়া এবং ব্রহ্মকে কর্ম জানিয়া নিষ্কাম ও নিরুদ্বেগ চিত্তে কাজ করিবার শিক্ষাই শ্রীভগবান্ আমাদের দিয়াছেন। ঘরে ফিরিয়া দেখিতেছ যে, ওখানেও কাজ আছে কিন্তু পরমেশ্বরকে সব সময়ে মনে রাখা যাইতেছে না। মনে মনে ভাবো না কেন যে, তোমার বাড়ীটীও আমাদের বারাণসীরই আশ্রম। আমি ত ইহাই চাহি যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রত্যেকটী গৃহস্থের গৃহ আমার এক একটী কর্ম্মযোগাশ্রমে পরিণত হউক। এই কর্ম্ম সর্ব্বজীবের কুশলকে লক্ষ্যে রাখিয়া। এই যোগ অনাদি অনন্ত নিরবধি কালের তত্ত্ব পরমেশ্বরের সহিত। এই আশ্রম নিরভিমান মান-যশো-লোভহীন শুভ্র সুগন্ধি বন-কুসুমের মত স্বভাবতঃ সুন্দর।

আগামীকল্য মালটিভারসিটি রেজিষ্টার্ড হইবে। দেখি, পরমেশ্বর কি করেন।

দারুণ অসুস্থ শরীরেও আমি কি করিয়া দিস্তার পর দিস্তা কাগজ লিখিয়া যাইতেছি ভাবিয়া তুমি বিস্মিত হইয়াছ। বিস্ময়ের কিছু নাই। সবই পরমেশ্বরের কৃপা। আমার নিজের কোনও শক্তিই নাই। কেবল

নির্ভর করিয়া আছি তাঁহার উপরে। তিনি কাকে দিয়া কখন কি করাইবেন, তিনিই জানেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা
১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮০
(১৬ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা সময় মতই পাইয়াছি কিন্তু কাল মালটিভারসিটির রেজিষ্ট্রেশানের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, উত্তর লিখিবার অবকাশ করিতে পারি নাই।

গোঁড়া মতের পণ্ডিতবর্গের বাধার ভয়ে প্রণব সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কথা অনেকেই বলিতে চাহেন না। কেহ বলিতে চাহিলে তাহার মুখে গামছা গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার একটা সনাতনী রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ চালু রহিয়াছে। আমি নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার বিতরণ করিয়া অনেক খ্যাতিমান্ পুরুষের চক্ষুঃশূল হইয়াছি। কিন্তু আমার কাজ আমি করিয়া যাইব। লক্ষ্য করিও যে, প্রণব সম্পর্কে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি এবং অনুরাগ আস্তে আস্তে চারিদিকে পরিস্ফুট হইতেছে। এগুলি শুভলক্ষণ। কিন্তু প্রণব আমার সাধন-মন্ত্র, এজন্য এই জিনিষ নিয়া আমি প্রকাশ্যে বা জনসভায় আলোচনাতে খুব কমই প্রবৃত্ত হই। মনে

মনে ইহারও অগোচরে সঙ্গোপনে যে যত্ন সময় ইহার সাধন করিতেছি, বা করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা আমাকে নির্ভয় করিয়াছে। এইটুকুই আমার পরম সান্ত্বনা।

তোমার পত্র পাইয়া হাসি পাইল। হিমালয় দর্শনে বা সাগর-সমীপে আসিয়া সেই বিশাল বিপুল দৃশ্য দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মানুষ যেমন হতবাক্ হইয়া যায়, আমার সম্মুখে আসিলেও তোমার তাহাই হয় বলিয়া লিখিয়াছ। ইহাও ত এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি একটী সাধারণ মানুষ, তোমার মতই সাধারণ। আমি যদি অসাধারণ হইয়া থাকি, তবে তোমাদের মতই অসাধারণ, যাহারা সাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের পুঁজি লইয়া সুদীর্ঘ প্রযত্নে এক একটা কাজে নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিবার দরুণ অতীব দারুণ পরিশ্রমের ফলে এক একটা সাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করে। আমার ভিতরে অসাধারণত্ব কিছুই নাই, তোমরা বিশেষের ভাব-ভক্তির মহিমায় গোষ্পদকে সমুদ্র আর ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ডকে হিমালয় বলিয়া মনে কর। তোমাদের ভাব-ভক্তি-কল্পনাশক্তি তোমাদের মনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। তোমরা যে তুচ্ছের ভিতরে অসাধারণত্ব দেখিতে পাও, ইহা তোমাদের দৃষ্টিশক্তির এক সুমহৎ ঐশ্বর্য্য। আমিও সকল তুচ্ছের ভিতরে অসাধারণ, অসামান্য, অভাবনীয় মহত্ত্বকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কারণ, এইরূপ চেষ্টা সত্যই মঙ্গলজনক ও প্রশংসনীয়। তাই আমি স্ত্রী-শূদ্রাদি কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারি নাই। বহুজনপূজিত মহান্ ধর্ম্মাচার্য্যেরা আমার এই দৃষ্টি ও আচরণকে গর্হিত জ্ঞান করিয়া ক্ষিপ্তবৎ কুবাক্য-সমূহ উচ্চারণ করিতেছেন দেখিয়া আমার মনে এক কণা উদ্বেগও নাই।

তোমাদের ঐ স্থান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত কোনও এক থানার

একজন বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ধর্ম্মীয় নেতা যে পত্রখানা তোমাকে লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম জানিতে পারিলাম। তিনি তাঁহার সমাজভুক্ত অনেককেই অখণ্ডমণ্ডলীর ভিতরে প্রবিষ্ট করাইতে চাহেন, লিখিয়াছ। আমাদের অনেক কিছুই তাঁহাদের মনঃপূত বলিয়া মনে হইতেছে। সকলকে ব্রহ্মগায়ত্রী গানে অধিকার দান যে তন্মধ্যে মহত্তম আকর্ষণ, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমাদের কার্য্যক্রমের মধ্যে একটী নূতন সংযোজন চাহেন। তাহা হইতেছে এই যে, গায়ত্রী-মন্ত্রের সহিত যজ্ঞীয় আহুতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যজ্ঞকে অনাবশ্যক বা অবান্তর বলিতেছি না কিন্তু আমাদের উপাসনা-তন্ত্রের ভিতরে নূতনের আমদানী আমি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছি না। যে উপাসনা-তন্ত্র আমার নিকটে সুস্পষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বভাবের নিয়মে হইয়াছে, কোনও কৃত্রিম প্রচেষ্টায় নহে বা হিসাবী বুদ্ধির প্রভাবেও নহে। স্বাভাবিক বিকাশের মুখে যজ্ঞীয় অগ্নি আসিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই বলিয়াই আমাদের উপাসনা-তন্ত্রে যজ্ঞকে রাখা যায় নাই। একদা স্বভাবের সেই নিয়মে প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অগ্নি দেবতা রূপে বা পরব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন এবং "জুহোমি" বলিয়া ঋষি-নন্দনেরা হোমহবিঃ অর্পণ করিতেছিলেন, স্বভাবের সেই শৃঙ্খলা কি এক অজ্ঞাত কারণে হট্টগোল-সমাকুল বিরাট প্রদর্শনীতে পর্য্যবসিত হওয়াতে সহসা স্বভাবের মুখেই বেদবিরোধী নীতি-জ্ঞানীরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট প্লাবন আনিয়া চিন্তা ও আচরণের জগতে এক অকল্পনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, যাহার পরে মূল স্বাভাবিক প্রেরণার সহিত পরবর্ত্তী বেদাচার্য্যদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ, অক্ষত, অবারিত ও অবিমিশ্র রহিয়াছিল কিনা, ইহা একটা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয় যে, সেই কারণেই

অথগুরের উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে হোম এবং যজ্ঞ আনিয়া তবুই সুনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন নাই। এখন সভ্য-পুষ্টির সুযোগ বুঝিয়া যদি এতগুলি লোককে এক সঙ্গে অনুগামী রূপে পাইবার লোভে উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে নবপ্রবর্ত্তন বা নবসংযোজন শুরু করি, তাহা হইলে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যে কনস্টান্টিনোপলে আসিয়া সংখ্যাবৃদ্ধির অত্যাগ্রহের কুফল স্বরূপে যে বিভ্রাটে পড়িয়াছিল, ঠিক সেই বিভ্রাটই আমাদের বরণ করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা হোম-যাগ প্রভৃতি করিতে চাহেন, খুব ভাল কথাই ত। আমাদের সঙ্গে মিশিতে হইলে তাহাদিগকেও আমাদের মতপথ নিতে হইবে না, তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের মতপথ নিতে হইবে না। ধর্ম্মমত, ধর্ম্মপথ পরিহার না করিয়াও কি করিয়া সকল মতের লোক মিলিতে পারে, আমরা ত তাহারই অনুশীলন আমাদের জীবন-কর্ম্মে এবং সমবেত উপাসনাতে করিয়া যাইতেছি। তাঁহাদিগকে আমার মতাদর্শের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত হইতে লিখিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম।

পরবর্ত্তীকালে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের হ্রাস কি কারণে ঘটিল, সঠিক আমি বুঝিতে পারি নাই। যজ্ঞীয় অগ্নি স্মরণাতীত যুগের ঈশ্বরারাধনার পরম সহায়ক ও মহাশক্তির আধার। যতই আধুনিক মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে, যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ততই যেন দূরের বস্তু হইয়া যাইতেছে। কেন এরূপ হইল, ইহার প্রতীকার কি, অর্থনৈতিক সঙ্কট ইহার মধ্যে গণনীয় কিনা, হব্যপ্রদানকারী গোজাতির পরম অবনত দশা ইহার জন্য পরোক্ষে দায়ী কিনা, আমাদের "গোমাতাকী জয়" ধ্বনির ভণ্ডামি ইহার পশ্চাতে আছে কিনা এগুলি নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিবার কথা।

নিজ জীবনকে জগৎ-কল্যাণকর্ম্মে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিবার জন্য বা উৎকট পাপাদির প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞ যে কখনো কখনো অত্যাবশ্যক, ইহা আমি স্বীকার করি, বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বল্পায়ু কলি-জীবের পক্ষে নাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞ বা নীরব-নামজপ-যজ্ঞ অধিকতর প্রশস্ত। যাঁহার যেরূপ রুচি, তিনি তেমন করিবেন, ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। জপযজ্ঞ গীতায় সুপ্রশংসিত—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।" নামকীর্ত্তনযজ্ঞটী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দ্বারা পাঁচ শত বৎসর যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। উক্ত শাস্ত্র ও উক্ত মহাপুরুষের পদাঙ্ক নিশ্চয়ই বর্ত্তমান যুগে সহজে অনুসরণ-সাধ্য হইবে।

আমি অবশ্যই মনে করি যে, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন করার যাহা শুভফল, হরিওঁ নাম কীর্ত্তন করারও তাহাই শুভফল। কিন্তু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তনকালে তাঁহারা একটু অস্বাচ্ছন্দ্যে পড়িতে পারেন, যাঁহারা শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বা ভগবান্ বলিয়া ধারণা রাখেন না কিম্বা যাঁহারা নিরাকার ভাবেই ভগবদুপাসনায় রুচি ও আগ্রহ অনুভব করেন। আমি হরি, কৃষ্ণ, রাম এবং ওঁ বলিতে ঠিক একই রকম বুঝি, আমার মনে এই ব্যাপারে বিভ্রম বা দ্বিত্ববোধ নাই। কিন্তু অন্যের এইরূপ না হইতে পারে এবং পৃথক্ ভাবে ভাবিবার প্রত্যেকেরই নিজস্ব যে অধিকার আছে, তাহা আমাকে মুক্ত কণ্ঠে মানিয়া নিতেই হয়। "হরিওঁ" কীর্ত্তনের একটুকু আলাদা বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়া মতামতের যে-পার্থক্যই নানা জনের থাকুক না কেন, "ঈশ্বর যে আছেন" এই কথাটী "হরিওঁ" নাম কীর্ত্তনের দ্বারা বারংবার অনুস্মৃত হয়। "হরি" একটী শব্দ, "ওঁ" একটী শব্দ এবং এই দুইটী শব্দ একত্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে "হরিওঁ" একটী সুসম্পূর্ণ বাক্য। "হরি" বিশেষ্য, কর্ত্তৃস্থানীয়, "ওঁ"

অব্যয় হইলেও ক্রিয়াস্থানীয় । অর্থ = ঈশ্বর আছেন। পরমেশ্বরের অস্তিত্বের নিয়ত স্মারক এরূপ আর একটী শুভসংযোগ প্রাচীন বা নবীন কোনও ধর্ম্মসাহিত্যে বোধ হয় নাই। অথচ, আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এই মন্ত্রের আমি স্রষ্টা নহি। কার মুখে ইহা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ আদি যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ এই বিষয়ে কোনও খবর আজ তক্ বোধ হয় দিতে পারেন নাই। তাই স্বীকার করিতে হয় যে, এই নাম শাশ্বত ও সনাতন। আমার মুখে কলিযুগে সপ্তস্বরে সমন্বিত হইয়া প্রচারিত হইল বলিয়া আমার নিজস্ব কোনও কৃতিত্ব নাই, জানিও।

উপনয়ন-সূত্রে দ্বিজ-নন্দন উপনয়নের সময়ে উপবীত পাইল, ব্রহ্মগায়ত্রী পাইল, ওঙ্কারকে শুনিল, জানিল, বুঝিল। তাহার পরে পুনরায় আসিয়া কুলগুরু বা অন্য আচার্য্য তাহাকে আর একটী দীক্ষাদান কেন করিবেন? ইহার যৌক্তিকতা কি? কেন এরূপ প্রবর্ত্তন হইল? স্পষ্ট উত্তর এই যে, ইহা এক অপ্রাসঙ্গিক, নিষ্প্রয়োজনীয়, পুনরুক্তিদোষ-দুষ্ট, অতিরিক্ত অনুষ্ঠান। কিন্তু ব্রহ্মগায়ত্রীটাই ত মাত্র কোনও প্রকারে অতীতের ঐতিহ্য ধারণ করিয়া দেশটার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, যাহা একদা উজ্জ্বল হিন্দু-সভ্যতার অস্তিত্বের অধিকার রূপে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়া গেল, কিন্তু যাহার দার্শনিক তাৎপর্য্য নিয়া সপৈতক একটী দ্বিজ-নন্দনও একদিনের জন্য মাথা ঘামাইলেন না। দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারের দ্বারা অসমর্থিত বা দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার-বর্জ্জিত নামজপ কার্য্যকর হয় না। "তদর্থভাবনম্" একটী বড় কথা। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক আচার্য্যগণের পক্ষে প্রয়োজন হইল, অথবা তাঁহাদের আগ্রহ জন্মিল, গায়ত্রী-মন্ত্র-পূত পূর্ণ কর্ণকুহরগুলিতে আর

একবার একটা দেবতার বীজমন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার জন্য। পৈতা নিবার কতক বৎসর পরে আবার একটা দীক্ষা নিবার প্রথা-সৃষ্টি এই ভাবেই হইয়াছে। কিন্তু হুজুগ এখানেই থামিয়া গেল না। অধিকতর চতুর বা সমধিকতর প্রজ্ঞাবান্ আচার্য্যেরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওরে, উনি ত তোকে দীক্ষামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, শিক্ষাটা যে বাকী রহিয়া গেল, আমি তোকে শিক্ষামন্ত্র দান করিব। আর, উনি যদি ফুঁকিয়া থাকেন দক্ষিণ কর্ণ, আমি তোর বামকর্ণ ফুঁকিয়া দিব। তাড়াতাড়ি দক্ষিণার জোগাড় কর্ বাবা। জীবনে এমন সুযোগ আর পাবি না।" ব্যস, চমৎকার! একটা মানুষের কাণে একবার গায়ত্রী-মন্ত্র, একবার একটা দেবতার দীক্ষা-বীজ-মন্ত্র, আবার একটা দেবতার বা যুগলের শিক্ষা-বীজমন্ত্র ঢুকিয়া গেল। কেহ একবার চিন্তা করিয়াও দেখিলেন না যে, একটা অতীব সাধারণ মানুষের অতিক্ষুদ্র কর্ণকোটরে এতগুলি মন্ত্র মিলিয়া গিজগিজ করিতে থাকিবে কিনা, অথবা একটা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতরে তিন তিনটা আলাদা আলাদা দার্শনিক মতবাদের কচ্‌কচি প্রবেশ করিয়া তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত পাগল বানাইয়া ছাড়িবে কিনা। প্রত্যেক মন্ত্রের পিছনেই এক একটা করিয়া দার্শনিক পটভূমিকা আছে, যাহাকে বাদ দিয়া সেই মন্ত্রকে উপলব্ধিগত করা সুকঠিন বা অসম্ভব।

কিন্তু গুরুদেবের মন্ত্রদান এখানেই থামিল না। কাহারও কোষ্ঠীর ফল খারাপ। তাহার প্রতিষেধনার্থ কিছু তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ করিতে হইবে। এই জন্য যজমানকে আবার আর একটা মন্ত্র লইতে হইবে। নতুবা তান্ত্রিকাচার্য্য অভিসম্পাত দিয়া ঝাড়ে বংশে নির্ব্বংশ করিয়া দিতে পারেন। সম্প্রতি একটী শিক্ষিত ধনবান্ গৃহস্থ তাঁহার

পত্নীকে নিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিলেন যে, তান্ত্রিকাচার্য্য গ্রহশান্তির নাম করিয়া মন্ত্রদানচ্ছলে তাঁহার পত্নীর শরীরে সত্তের বার শ্লীলতাহানি ঘটাইয়াছে এবং কুমারী পূজার নাম করিয়া অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার উপরে ধর্ষণ চালাইয়াছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যেই সকল ধর্ম্মধ্বজীরা মানুষকে মন্ত্রদান করিয়া উদ্ধার করিবার অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে, বারংবার মানুষকে নিত্য নূতন মন্ত্র নিয়া সাধনারণ্যের কণ্টক-সমাকুল দুর্গম গহনে পড়িয়া অবিশ্বাসের দাবানলে দগ্ধ হইবার দুঃখ দান তাহারাই করিতেছে। ইহারা পরিত্রাতা নহে, ইহারা প্রতারক। কিন্তু তুমি, আমি এবং সকলে প্রতারকদিগকেই ত সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। তাই আমরা নীরবে এত বড় একটা আধ্যাত্মিক অত্যাচার সহিয়া যাইতে মানুষকে বুদ্ধি দিতে পারিতেছি। আমার মতে, একবার যে একটী দীক্ষা নিয়াছে, তাহার আর অন্য মন্ত্রে মন দেওয়াই উচিত নহে। একটাকে লইয়া লাগিয়া থাকিলেই সাধক একদা মানুষের চূড়ান্ত লভ্যটুকু পাইয়া যাইবে। সুতরাং দিনের পর দিন যতই নিত্য নূতন গুরুদেবদের আবির্ভাব ঘটুক না, দীক্ষিত ব্যক্তির পুনরায় আর একটী মন্ত্র নিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তুমি তোমার গুরুর কাছ হইতে যেই মন্ত্র পাইয়াছ, তাহা প্রণব নাও হইতে পারে। কিন্তু নিজ মন্ত্র জপিতে জপিতে তোমার ভিতরে আপনা আপনি সর্ব্বমন্ত্রের মূলাধার প্রণবের আবির্ভাব ঘটিল। তখন তুমি প্রণবেই মজিয়া যাও। ইহাতে গুরুত্যাগ হয় না। সদ্গুরুর মন্ত্র জপিতে জপিতেই ত এই সুদুর্লভ অবস্থাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৫৪
৩রা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮০
(১৮ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আসিবার দিন তোমার চেহারা দেখিয়াছিলাম মলিন, বিমর্ষ এবং নিষ্প্রভ। মনে বোধ হয় অশান্তি ছিল, শরীরেও হয়ত পীড়া ছিল। তোমার তরুণ জীবনের সদাহাস্যময় মধুর মুখচ্ছবি তখন বারংবার মনে পড়িতেছিল। দুর্ভাবনা সম্ভবতঃ তোমার মনের শান্তি অপহরণ করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হও।

সম্প্রতি তোমাদের ওখানে একটা সম্মেলন হইয়া গেল। তুমি কি তাহাতে উপস্থিত ছিলে ? হয়ত বা খবরই পাও নাই। আমি অন্য এক সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, যাঁহাদের কাছে কর্ম্ম-তৎপরতার প্রত্যাশা ছিল, তাঁহারা যোগ্য স্থানগুলিতেও খবরাখবর পৌছাইবার কাজটীতে ত্রুটি রাখিয়াছেন। বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ কর্ম্মীরা আসিয়া সম্মেলন করিয়া যাইবেন, এইরূপ ঘটনা প্রত্যহ যে ঘটে না, ঘটানো যে সম্ভব নহে, একথা ভারপ্রাপ্তেরা স্মরণে রাখেন নাই।

ধর্ম্মীয় কাজ বা সাংঘিক কর্ত্তব্য পালনের প্রশ্ন আসিলে তোমরা অতীত ভুলিয়া এবং সাংসারিক ব্যাপারে কাহার সহিত কি নিয়া কলহ ছিল, তাহার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, প্রকৃত ভক্তিমান্ সাধকের ন্যায় একত্র যে হইতে পার, আশা করি, তাহার প্রমাণ প্রদর্শনের একটী

প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইয়া তোমরা সকলে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছ। আজ তোমরা যাহা করিবে, কাল তোমাদের পুত্রকন্যারা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবে, এই কথাটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিয়া তোমরা অতীত নিয়া অশান্তি আহরণের চিরপ্রচলিত কদভ্যাসটীর রাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য-বিধানের চেষ্টায় সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত কর। সৎকার্য্য একটুকুও যদি কর, তবে তাহার ফলও অসামান্য জানিও। সম্প্রীতি, মৈত্রী এবং সহযোগিতার আবহাওয়াতেই উচ্চচিন্তার সহজে জন্ম হয় এবং ঐরূপ অনুকূল পরিবেশ পাইলেই সচ্চিন্তা অতি দ্রুত সৎ-কর্ম্মের রূপ পায়। অনুক্ষণ মনে রাখিও, তোমাদের পিতা, পিতৃব্য, পিতামহের পুণ্যফলে তোমরা বর্ত্তমানে সুসমৃদ্ধ। সেইরূপ তোমাদের পুণ্যফলের সুপ্রত্যাশা তোমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-১১
৩রা আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার চারিদিন আগেকার লেখা পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জেলার সকলগুলি মণ্ডলীকে একস্থানে আনিয়া একটী সম্মেলন করিয়া

কতকগুলি সৎসঙ্কল্প গ্রহণ করিবে এবং জেলা ব্যাপিয়া তদনুকূল কাজ সুরু করিয়া দিবে, ইহা খুবই আনন্দের কথা। সকলে সকলের বক্তব্য ধীর ভাবে শ্রবণ করিও এবং কাহার প্রস্তাব হইতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য কর্ম্মসূচী তৈরী করিতে পার, তার দিকে লক্ষ্য রাখিও। বক্তৃতা দেওয়া আর বক্তৃতা শোনা কিন্তু খুব বড় কাজ নহে। বড় কাজ হইতেছে বাস্তব কর্ম্মে বাহু-প্রসারণ করা এবং লক্ষ্যলাভ পূর্ণতঃ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবলই কাজ করিয়া যাইতে থাকা। এই ব্যাপারে আত্মশ্রদ্ধার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে আর প্রয়োজন আদর্শদাতার প্রতি অবিচল আনুগত্য।

তবে, তোমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধার কথাটা তোমরা এখনো জানো না। জেলাটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব চেয়ে কুলীন কিন্তু এই জেলায় তোমাদের মণ্ডলীর সংখ্যা অত্যল্প। চতুর্দ্দিকে শত শত মণ্ডলী গড়িয়া স্থানে স্থানে সমবেত উপাসনার স্নিগ্ধ সুশীতল আবহাওয়াটী সৃষ্টি করাই আগের কাজ। যেখানে দুই তিনজন সমভাবের ভাবুক, সমসাধনার সাধক, সমপথের পথিক আছে, সেখানেই একটী প্রীতিমধুর স্নেহনীড় গড়িয়া তুলিতে হইবে সমবেত উপাসনার সাত্ত্বিকতার মাধ্যমে। একাজটী যেখানে করা হইবে না, সেখানে মণ্ডলী গঠন এক প্রকারের পণ্ডশ্রম মাত্র। তোমাদের মিলনের,—মঞ্চই বল আর সেতুই বল —যে মহাবস্তুটী হইতেছে স্বর্ণসূত্র, তাহার নাম সম্প্রদায়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত সমবেত উপাসনা। একাজটীতে ফাঁকি রাখিয়া পাঠাগারই কর, ব্যায়ামাগারই কর, বক্তৃতা-মঞ্চই কর আর প্রদর্শনীই কর, সব ফাঁকি, সব ফাঁকা, সবই ফক্কিকার, জানিও।

আর একটী কথা বিশেষ ভাবে বলিতে চাহি যে, তোমরা যেখানেই যেরূপ সৎ-চর্চ্চা কর না কেন, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে একটা সাধু

আলোচনা তোমাদের কার্য্য-তালিকা-ভুক্ত যেন থাকেই থাকে। এই কাজটীতে কেহ অবহেলা করিও না। ইহাকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না। তোমরা বয়স্কেরা হয়ত দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া চলিতে সমর্থ হইতেছ না কিন্তু এতদ্বিষয়ে তোমাদের যে আন্তরিক একটা অনুরাগ আছে, এ কথাটা নিজের কাছে, পরের কাছে, সকলের কাছে নির্ভয়ে ব্যক্ত করার ভিতরে একটা মস্ত শুভফল এই যে, তোমাদের পরবর্ত্তীরা যদি হঠাৎ কেহ কথাটাকে ভাল ভাবে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে তোমাদের চেয়ে দক্ষতর ভাবে কথাটাকে নিজ জীবনের কাজে লাগাইতে পারিবে। ইহা সমগ্র জাতির পক্ষে এক পরম লাভ। "ব্রহ্মচর্য্য" বলিয়া একটী শব্দ এই ভারতের ভূমিতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের আশান্বিত থাকিবার কারণ আছে যে, সর্ব্বপ্রকারে হৃতসম্পদ হইলেও একদা ইহারই মহিমাতে আমরা আমাদের পূর্ব্ব-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিব, করিতে পারিব। সুতরাং যেখানেই তোমরা নিজেদের নিয়া যেই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কর, প্রত্যেকটাতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল আবহাওয়ায় সৃষ্টিকারক আলোচনা কিছু করিও। তবে, যাহারা সত্য সত্যই দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিয়া চলিয়াছ, তাহারা মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বন করিও; কারণ, বাহিরে বাহাদুরী সুরু হইয়া গেলে দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান স্তম্ভটী দ্রুত ধ্বসিয়া পড়ে,—ইহা সর্ব্বনাশকর।

আগামী ১লা জানুয়ারীর পুপুন্কীর অনুষ্ঠানকে "উৎসব" নাম না দিয়া যে "উদ্বেগ" নাম দিয়াছি, তাহার নিশ্চয়ই তাৎপর্য্য আছে। সিমেণ্ট পাওয়া যাইতেছে না, কাজকর্ম্ম বন্ধ। বাঁকুড়া হইতে কুলীরাও এবার আসিতেছে না, কূপখনন, মাটি-ভরাট সব বন্ধ। যাহা থাকিবে

বেপরোয়া হইয়া সিমেণ্ট ও কুলী যে-কোনও স্থান হইতে যে-কোনও উপায়ে আনা যায়, তাহার খবর অপ্রকাশ্য। অথচ দিনগুলি তর্ তর্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বল, উৎসব বলিব, না, উদ্বেগ বলিব? যাহা হউক, আমার সেই অবশ্যম্ভাবী উদ্বেগ নিয়া তোমরা আবার উদ্বিগ্ন হইও না। তোমরা ঠাণ্ডামাথায় সেই কাজগুলি করিয়া যাইতে থাক, যে কাজগুলি ভগবানের কাজ। স্থানে স্থানে নূতন অখণ্ডমণ্ডলী সৃষ্টি দ্বারা নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা চালু কর, উপাসনাতে উপস্থিতির সংখ্যাবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টা কর, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ করিয়া যাইবার অভ্যাস কর। এই উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগত মানাভিমান বিসর্জ্জনের অভ্যাসটা আয়ত্ত কর, মণ্ডলী এবং উপাসনাকে সর্ব্ব-কলহ-কচায়নের উর্দ্ধে রাখ। আর একটী কাজ এই কর যে, ঘরে ঘরে গিয়া জনে জনকে ডাকিয়া আনিয়া অখণ্ড-সংহিতার বাণী দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেবল শুনাইয়া যাও। * * * সকলকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দাও যে, মালটিভারসিটির দ্বারোদ্ঘাটনের সময়ে আমি কোনও উৎসবের ব্যবস্থা রাখিব না। সেই সময়ে জনতার কোলাহলও চাহি না। একাজটী করিতে চাহি, নীরবে নিভৃতে একান্তে। তোমরা আসিতে চাহ, যত জন ইচ্ছা, আগামী বৎসরের শারদীয় ছুটীতে আসিও। তখন পনের দিন থাকিয়া যাইও। তখন আমি আতিথ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা রাখিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৫৪

৩রা আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক দীক্ষার্থী তোমাদিগকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যাকুল করিতেছে যে বাবামণি কবে আসিবেন, ইহা শুভসংবাদ না অশুভবার্ত্তা, মনে মনে বিচার করিয়া দেখিও। দুষ্ট গরুতে গোয়াল ভরিয়া যাওয়াটা গোপালকের পক্ষে মঙ্গল না অমঙ্গল, চিন্তা করিও। এত লোক যখন আগ্রহী, তখন একটা ফাঁকে তোমাদের ওখানে যাইবার জন্য একটা ভ্রমণ-তালিকা করার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু তোমরা আগে নিজেদের কার্য্য ও তৎকর্ম্ম-ফলগুলির হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিও যে, তোমাদের পরিচয়ে যাহারা আসিয়া আমার সাধক-গোষ্ঠীর সংখ্যা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবেন, তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণের পরে কি করিবেন, কি হইবেন, কেমন কাজ করিবেন এবং অন্যকে কেমন কাজে প্রবর্ত্তিত করিবেন। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তোমরা কোনও দীক্ষাপ্রার্থীর ব্যাকুলতাকে অকৃত্রিম বস্তু বলিয়া ধরিয়া নিও না।

তোমরা নিজেরা কি সাধন-নিষ্ঠ? তাহা হইয়া থাকিলে তোমাদের পরিচয়ে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের কাছে সাধন-নিষ্ঠা প্রত্যাশা করা চলে। তোমরা কি আদর্শের অনুগত, আদর্শদাতার প্রতি অনুরক্ত, তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস-ভালবাসা কি নিখাদ, নির্ভেজাল? তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে তোমাদের পরিচয়ে যাহারা আসিবে, তাহাদের কাছে ঐ সকল সদ্‌গুণের আংশিক হইলেও বিকাশ প্রত্যাশাতীত নহে। তোমরা কি নিজ নিজ জীবন-যাপনে এবং পরিচিন্তনে অনুধ্যানে সততা-পরায়ণ, সভ্যশীল, সংযমাগ্রহী? তাহাই হইয়া থাকিলে, তোমাদের পরিচয়ে যাঁহারা যাঁহারা দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করিবেন তাঁহাদের সম্পর্কে আশাশীল মনোভাব পোষণ করিবার সঙ্গত কারণই রহিয়াছে। তোমরা আগে নিখাদ, নির্ভেজাল, অকৃত্রিম স্বর্ণ হও। নূতন দীক্ষার্থীদের আকর্ষণ করিবার আগে তোমাদের এইটা হইতেছে বড় প্রয়োজন।

দুষ্ট লোক দিয়া দীক্ষামণ্ডপ পূর্ণ হইতে দিও না। বলিবে, দুষ্ট যে কে, তাহা তোমরা চিনিবে কি করিয়া? আমি বলিতেছি যে, যাঁহারা পরনিন্দায় রুচিশীল, তাহারা দুষ্ট। যাহারা স্বার্থের প্রয়োজনে চাটুকারিতা করে, তাহারা দুষ্ট। যাহারা নারী বা পুরুষ সংশ্রবে শালীনতা বিসর্জ্জন দিয়া গোপনে বা প্রকাশ্যে অনাচার ও ব্যভিচার করে, তাহারা দুষ্ট। যাহারা মদিরা, গঞ্জিকা, জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত, তাহারা দুষ্ট। যাহারা অকৃতজ্ঞ, নৃশংস ও লম্পট, তাহারা দুষ্ট। যাহারা মানুষে মানুষে কলহ সৃষ্টি করিয়া দিয়া মজা দেখিতে বা স্বার্থ লুটিতে ভালবাসে তাহারা দুষ্ট। দুষ্টের আর কত রকম তালিকা দিব? দুষ্টকে বর্জ্জন করিবে। বলিতে পার, দুষ্টের কি উদ্ধার হইবে না? হইবে, কিন্তু অনুতাপের অনলে পাপের তাণ্ডব দগ্ধ করিয়া ছাই করিয়া দিবার পরে,—তাহার পূর্ব্বে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০

(২১ শে জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ভাবিয়াছিলে, অমুক পাড়াতে বিরুদ্ধ বাতাস বহিতেছে, অমুক পাড়ার লোকগুলি অত্যধিক শিক্ষিত

এবং তৎকারণেই জ্ঞানাভিমানী, সুতরাং তোমাদের কাজে সফলতা আসা কঠিন। কিন্তু দেখ, সংঘবদ্ধ চেষ্টা, আত্মশ্রদ্ধায় উজ্জ্বল প্রয়াস ও জনে জনের সাধ্যমত নিজ নিজ ক্ষুদ্র কর্ম্মাংশকে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিবার আগ্রহই পরিণামে জয়ী হইল। এই জয় তোমাদের নহে, এই জয় পরমেশ্বরের পরমপুণ্যময় মহানামের। এই বোধ রাখিয়া নিজেদিগকে পরমপ্রভুর একান্ত অনুগত সেবক জানিয়া পরস্পরের প্রতি কুণ্ঠাহীন বিশ্বাস, সম্প্রীতি ও সহযোগিতাবুদ্ধি লইয়া তোমরা কাজ করিয়া যাইতে থাক। তোমাদের জয় সুনিশ্চিত।

কোনও মত, পথ বা সঙ্ঘের সহিত তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, জানিও। সব মতাবলম্বীরাই নিজ নিজ ধারণানুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধিতে চেষ্টা করিতেছেন, তোমরাও নিজেদের বিশিষ্ট ধারণার অনুযায়ী সেই একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ। প্রতিটি পন্থাবলম্বী অন্য পন্থাবলম্বীদের কাজের অনুপূরক বা পরিপূরক। এই বিশ্বাস নিয়া প্রীতিসহকারে নিরুদ্বেগ চিত্তে কাজ করিয়া যাইবে। পণ কর, একটী সহকর্ম্মীকেও অলস হইতে দিবে না, উদাসীন থাকিতে দিবে না। আত্ম-বিশ্বাস হারাইতে দিবে না। যে কাজগুলিতে তোমরা অন্যান্য বহু সঙ্ঘের নিকটে প্রায় পথপ্রদর্শকের মত চলিতেছ, সেই কাজগুলিতে তোমরা যেন তোমাদের আলস্য বা অবসাদের দোষে পিছনে পড়িয়া না যাও, এই বিষয়ে তীব্র আগ্রহ নিয়া চলিতে থাক। অনেক দিন পরে তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের একটা গতি-বেগ বা টেম্পোর সৃষ্টি হইয়াছে। এই টেম্পোটা যেন আর না কমে। পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ উৎসাহ, পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস লইয়া তোমরা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কাজ করিয়া যাইতে থাক।

শহরে বা পল্লীতে এমন একটী প্রাণীও যেন না থাকে, যে অখণ্ড-সংহিতার প্রাণদায়ক উপদেশ না শুনিয়াছে। একটী প্রাণও যেন না থাকে, যে হরিওঁ মহাকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আনন্দে বিভোর না হইয়াছে। পরমেশ্বর আছেন, এই বিশ্বাসে ভরপূর হইয়া প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের দিকে ভ্রাতৃস্নেহারুণ কোমল দৃষ্টিতে তাকাইতে শিখুক,—ইহাই তোমাদের লক্ষ্য। ইহা অপেক্ষা হেয়তর লক্ষ্যের প্রতি তোমাদের যেন দৃষ্টি না পড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৬ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুদূর হইতে তোমাদের কৃতী ও কর্ম্মী ভ্রাতারা পথশ্রম সহ করিয়া এবং অর্থব্যয় করিয়া তোমাদের ঘরের দুয়ারে আসিবেন আর দেখিয়া যাইবেন যে, তোমাদের মধ্যেই আগ্রহ নাই, তোমরা নিজেরাই আসিয়া অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিলে না, এই অবস্থাটা বড়ই মারাত্মক। আমার প্রেরিত কর্ম্মীকে যাহারা অনাদর করিল, তাহারা প্রকারান্তরে আমাকেই যে অনাদর করিল, এই কথাটুকুও কেহ বোঝে না? কাছাড়ের শ্রীমান্ তোর একটা পায়ের অস্থিভঙ্গ নিয়া ভুগিতেছিল এবং প্লাষ্টার খুলিয়া

শহরে বা পল্লীতে এমন একটী প্রাণীও যেন না থাকে, যে অখণ্ড-সংহিতার প্রাণদায়ক উপদেশ না শুনিয়াছে। একটী প্রাণও যেন না থাকে, যে হরিওঁ মহাকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আনন্দে বিভোর না হইয়াছে। পরমেশ্বর আছেন, এই বিশ্বাসে ভরপূর হইয়া প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের দিকে ভ্রাতৃস্নেহারুণ কোমল দৃষ্টিতে তাকাইতে শিখুক,—ইহাই তোমাদের লক্ষ্য। ইহা অপেক্ষা হেয়তর লক্ষ্যের প্রতি তোমাদের যেন দৃষ্টি না পড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৬ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহুদূর হইতে তোমাদের কৃতী ও কর্ম্মী ভ্রাতারা পথশ্রম সহ্য করিয়া এবং অর্থব্যয় করিয়া তোমাদের ঘরের দুয়ারে আসিবেন আর দেখিয়া যাইবেন যে, তোমাদের মধ্যেই আগ্রহ নাই, তোমরা নিজেরাই আসিয়া অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিলে না, এই অবস্থাটী বড়ই মারাত্মক। আমার প্রেরিত কর্ম্মীকে যাহারা অনাদর করিল, তাহারা প্রকারান্তরে আমাকেই যে অনাদর করিল, এই কথাটুকুও কেহ বোঝে না? কাছাড়ের যতীতোষ একটা পায়ের অস্থিভঙ্গ নিয়া ভুগিতেছিল এবং প্লাষ্টার খুলিয়া

ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায় ছুটিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, ফিরিবার মুখে খোয়াই যাইবার পথে সে চেবরীর নৌকাঘাটায় একটীর বদলে দুইটী অস্থিভঙ্গ নিয়া স্বস্থানে পৌঁছিয়াছে। এরূপ কর্ম্মীরা কি বারংবার তোমাদের অঞ্চলে আসিবে?

করিমগঞ্জ হইতে তোমাদের ওখানে ১লা জুন শ্রীমান্ রঞ্জিৎ কুড়ি পঁচিশটী কণ্ঠবান্ ও কণ্ঠবতী সুগায়ক-সুগায়িকা নিয়া হরিও-কীর্ত্তন করিতে আসিল আর তোমাদের শহরের গণ্যমান্য অথণ্ডেরাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলেন না, ইহাও এক বিচিত্র সংবাদ। এত অবহেলা, এত অবসাদ কিসের লক্ষণ? বৃদ্ধির না মৃত্যুর? একথা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

তবে, একটী কথা তোমাকে জানাইতেছি যে, এসব দেখিয়া তুমি বা তোমার সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অবসাদ-গ্রস্ত হইও না। শক্তি যতই ক্ষীণ হউক, কাজ তোমাদের করিয়া যাইতেই হইবে। এমন শ্মশান আমি স্বচক্ষে একদিন দেখিয়াছি, যেখানে এক সঙ্গে একশত পঁয়ত্রিশটী কলেরার মড়াকে মোটা লোহার তার দিয়া বাঁধিয়া নিয়া শত তিনেক মণ পাথুরে কয়লা দিয়া দাহ করা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্মশানে জীবিত মানুষ একলা আমিই ছিলাম। অন্যগুলি মৃত বলিয়া তাহারা নড়ে নাই, চড়ে নাই, কথা কহে নাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাই, কাঁদে নাই, গান গাহে নাই। মৃতেরা বা মৃতকল্পেরা কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিল না বলিয়া দুঃখ না করিয়া অল্পাবশিষ্ট কতিপয় জীবিত ব্যক্তি যে যোগ দিয়াছিল, তাহাতে যেটুকু আনন্দ করিবার, তাহা কর।

বাধার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হইতেছে। বাধা ত' থাকিবেই কাজ ছাড়িয়া দিও না। বিশ্বাস রাখ যে পরিণাম শুভ। বিশ্বাস রাখ

যে তোমার কাজ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আর, প্রাণপণে ভগবানের নামের সেবা করিয়া যাও। নামই জীবনের পরমামৃত, কারণ নাম হইতেই প্রেম উপজাত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ই আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও

হুজুগে দীক্ষা নিলে লোকে গুরুকে না জানিয়া, তাহার মতামত না বুঝিয়া, ঝোঁকের বশে দীক্ষা নেয়। পরে দুদিক আর সামলাইতে পারে না। পূর্ব্বসংস্কার এক দিক দিয়া তাকে টানে, অন্য দিক দিয়া নবদীক্ষার বিধিগুলি। এমতাবস্থায় আচরণে যে অসামঞ্জস্য ঘটে, তাহা নিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া ভুল। তাহাকে গুরুদত্ত সাধন করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দাও। সাধন করিতে করিতে তাহার প্রকৃত মঙ্গলাভিমুখিনী রুচির সৃষ্টি হইবে, গুরুবাক্যের অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িবে। দীক্ষা নিবার পরে অন্য যুক্তি-তর্ককে মোটেই আমল না দিয়া কেবল সাধন করিয়া যাইতে থাকা দরকার। এত করিয়া ত আমি বলি যে, তোমরা কেহ আমার দীক্ষামণ্ডপে হুট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িও

না। প্রত্যেকে দীর্ঘকাল আমার চিন্তা-ভাবনা, ও ধ্যান-ধারণাগুলির সঙ্গে ভাল ভাবে নানা রূপে পরিচিত হও, তারপরে প্রয়োজন বোধ করিলে দীক্ষা নিও। কেহ যে সেই কথাটায় কর্ণপাত করিতেছে না, ইহা শুধু আশ্চর্য্যজনকই নহে, বিপজ্জনকও। একই গুরুর শিষ্যেরা নানা স্থানে নানা মতে যদি নিজ নিজ ইচ্ছামতন শাস্ত্র তৈরী করিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন কদাচ সৃষ্ট হইবে না অর্থাৎ তোমরা সঙ্ঘ হিসাবে জগতে কদাচ বলবান্ হইতে পারিবে না।

অনেকে দীক্ষামণ্ডপে অনেক প্রকারের পূর্ব্বসংস্কার নিয়াই প্রবেশ করে। কিন্তু যাহাদের গুরুতে আস্থা গভীর এবং দীক্ষাগ্রহণের প্রেরণা অকপট, তাহারা দীক্ষা গ্রহণের পরমুহূর্ত্তে এক নূতন জীবনের আস্বাদন পায়, যাহার ফলে তাহারা সকল পূর্ব্বসংস্কারকে নিমেষে এবং সবলে ধুলিসাৎ করিয়া দিয়া এক মনে, এক প্রাণে, এক মতে, এক পথে অবিচলিত বিক্রমে চলিতে সুরু করে। গুরুর নিকটে শিষ্য যদি কোনও অভিপ্রেয় বস্তু হইয়া থাকে, তবে গুরু নিশ্চয়ই একমাত্র এইরূপ শিষ্যই চাহিবেন। দৈবক্রমে যাহারা এমন উচ্চ স্তরের শিষ্য নহে, তাহাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসম্পূর্ণতা ক্ষমা করিয়া উদার-স্বভাব গুরুরা আপাততঃ তাহাদের দুই নৌকায় পা রাখিতে বাধা দেন না, কিন্তু সুদীর্ঘকাল এই ভাবেই চলিতে থাকিলে উহা শিষ্যদের পক্ষে যেমন মারাত্মক, ধর্ম্ম-সঙ্ঘের পক্ষেও তেমনি সাংঘাতিক।

কে কোন্ দেবতাকে মানে, কে কোন্ দেবতাকে মানে না, এসব প্রশ্নের জবাব দীক্ষার আগেই হইয়া যাওয়া উচিত। দীক্ষা গ্রহণের পরে গুরুদত্ত সাধন-মন্ত্রের কৌলীন্য নিয়া প্রশ্ন উঠা ভাল কথা নহে

শিষ্য বাড়াইবার আকাঙ্ক্ষা নিয়া কবে আমি এমন আকুল হইয়াছি যে, যার যাহা মত থাকুক না কেন, আমার কাছে শির নোয়াইতেই হইবে, এমন অসুন্দর বায়না করিব? "দীক্ষিত হইব" বলিলেই তোমরা কাহাকেও আনিয়া আমার দীক্ষামণ্ডপে হাজির করিয়া দিও না। সে আগে আমার সমস্ত চিন্তা-প্রণালী এবং কর্ম্মধারার সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে পরিচিত হউক,— দীক্ষার প্রশ্ন ত তাহার অনেক পরে উঠিবে। কথাটা মনে রাখিও। শরীরটা ভ্রমণ-ক্ষম থাকিলে কিছুকাল পরেই ত তোমাদের জেলার দুইটী শহরে আমার আসার প্রগ্রাম হইবে। যাহা করিয়া রাখিলে দীক্ষার গৃহে একটীও বাজেলোক প্রবেশ করিতে না পারে, তোমরা তদ্রূপ কাজে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে পদ্ধতিবদ্ধ ক্রমে করিয়া যাইতে লাগিয়া যাও। বিশ্বের সকলকেই আমি অতি কাছে পাইতে চাহি। কিন্তু তাহারা আগে আমার ভাব ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়া আত্মীয় হইবার চেষ্টা করুক। দুষ্ট গরু গোয়ালে ঢুকাইয়া পরে ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গাইয়া তাহাকে সংশোধিত করিবার অবসর, ধৈর্য্য এবং পরমায়ু এই তিনটার একটাও আমার সুপ্রচুর নাই।

বিপদে আপদে পড়িলে মানুষ মানৎ বা মানসিক করে, ইহা কোনও দোষের কথা নহে। বরং এই উপলক্ষ্যে মনটা যে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইল, ইহা একটা মস্ত লাভ। বিপদে না পড়িলে অনেক লোকই সারা জীবন একটী বারও পরমেশ্বরের কথা বোধহয় ভাবিত না। কেহ শনি-পূজার মানৎ করে, কেহ পাঠা বলি দিয়া দুর্গাপূজার মানৎ করে, কেহ মহিষ বলি দিয়া রক্ষাকালীর পূজার মানৎ করে, কেহ মেষ বলি দিয়া বিষ্ণুপূজার মানৎ করে, কেহ বা মুরগী বলি দিয়া কুঁদড়া পূজার মানৎ করে। কে কোন্ দেবতাকে মানিবে কিম্বা মানিবে না, ইহা সম্পর্কে

তার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু অখণ্ড-মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তিস্থল, স্বীকৃতি এবং সমন্বয়, সেই হেতু অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষা নিবার পরে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানৎ বা মানসিকের কোনও আবশ্যকতাই থাকে না। অখণ্ডদীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যদি কেহ পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ ঐরূপ কোনও মানৎ বা মানসিক করিয়াই থাকে, তবে অখণ্ডদীক্ষা পাইবার পরে সে নিশ্চয়ই অনায়াসে একমাত্র সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহার মানসিক শোধ করিয়া দিতে পারে। এই ভাবে মানৎ শোধ করিলে কোনও প্রত্যবায় ঘটে না, জানিও। তথাপি মনের দুর্ব্বলতা-বশতঃ যদি কেহ পূর্ব্বপ্রচলিত মতেই মানসিক শোধ করিতে অত্যাগ্রহী হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিয়া কি তোমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সুরু করিবে? তাহাকে তাহার কাজ নিজ খুশীমতন করিতে দাও, কিন্তু তোমরা মনে রাখ যে, তোমাদের কাহারও ভবিষ্যতে কোনও মানৎ করিবার আগ্রহ বা প্রয়োজন-বোধ জন্মিলে তোমরা যে সমবেত উপাসনা দিয়াই পরমেশ্বরের তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিবে, তাহায় যেন অন্যথা না হয়। শতকোটি দেবতা এবং কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র একমাত্র ওঙ্কারেরই অনুগত সেবক মাত্র। তোমরা রাজরাজেশ্বর মহাসম্রাটের নাম জানা থাকিতে কেন পেয়াদা, গোমস্তা, আর্দ্দালী, পেস্কার আর নায়েবের তুষ্টি সাধনে বৃথা কালক্ষেপ করিবে? সর্ব্বমূলাধার অখণ্ডনাম যাহারা পাইয়াছে, তাহারা আর অন্য দিকে তাকাইবে কেন?

যে দম্পতী নিঃসন্তান বলিয়া মনে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে বলিও যে, তাহারা যেন অকপটে ভগবানের সাধন করিয়া যাইতে থাকে। ঈশ্বরেচ্ছায় নিশ্চয় যথাকালে তাহাদের বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে।

যাহাতে তাহাদের বংশের কল্যাণ, ভগবান নিশ্চয়ই যথাকালে তাহা করিবেন। অধীর বা অস্থির না হইয়া নাম-যোগে তাহারা নিরত পরমেশ্বর-চরণে নিজেদের দেহ-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিতে থাকুক।

তোমার পুত্র শ্রীমান্ হ—কে অখণ্ড-মতে বিবাহ দিতে চাহ শুনিয়া সুখী হইয়াছি। যে মতেই বিবাহ দাও, সব মতেই বিবাহ সুসিদ্ধ, যদি সেই মত সকল সম্ভ্রান্ত সজ্জনের এবং আত্মীয়-পরিজনদের শ্রদ্ধাপূত হয়। প্রথাগত প্রচলিত মতে বিবাহ করার দিকে যদি বর বা কনের বা তাহাদের আত্মীয়বর্গের আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে তাহাও দিতে পার। জোর করিয়া আমি একটা নূতন মত চালাইতে চাহি না, যদিও একদা অখণ্ড-মতে বিবাহ প্রত্যহ হইবে এবং হাজার হাজার হইবে।

ভগবান্‌কে যে যেই নামে ডাকিতে চাহে, ডাকুক, তাহার সহিত আমার কোনও মতভেদ নাই। তবে কেহ দীক্ষা-গ্রহণ করিলে তার পক্ষে গুরুদত্ত নামেই ভগবানকে ডাকা সঙ্গত। কিছুদিন ডাকিতে ডাকিতে স্পষ্ট অনুভবে আসিবে যে, কেন সঙ্গত। এই বিষয়ে বিস্তারিত পত্রে লিখিবার অবসর নাই। অনেকে যে দেরীতে দীক্ষা নেয়, গুরুকে বাজাইয়া তবে দীক্ষা নেয়, কিম্বা নিজের মনকে যাচাই করিয়া তার পরে দীক্ষা নেয়, ইহা আমার মতে কোনও দূষ্য ব্যাপার নহে। দীক্ষা নিবার পরে সাধন করিল না, এমন দীক্ষার চেয়ে, অনেক দেরী করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া, হিসাব করিয়া দীক্ষা নিল, ইহা অনেক ভাল। কে কাহার কাছে দীক্ষা নিল, ইহা নিয়া আমার মাথাব্যথা নাই। কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই যেন সাধন করে, আমি ইহা চাহি।

একটা বিষয়ে শতবার সহস্রবার কথা বলিয়াও আমার কোনও শান্তি নাই। তাহা এই যে, আমার নিকটে যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে,

তাহারা যেন নিজ নিজ জীবনে অল্প মাত্রায় হইলেও ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করে, তাহারা যেন অন্যের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য অল্প হইলেও প্রয়াস পায়। তরুণ কৈশোর হইতে আমি এই কথাটী অকুণ্ঠ বিক্রমে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বলিয়া আসিতেছি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যাইবার দিনও, যদি হুঁশ্‌ থাকে, তবে আমি এই কথাটী বলিতে বলিতেই হাসি মুখে চিরবিদায় নিব। দীক্ষা যখন আমার নিকটই নিয়াছ কিম্বা ভবিষ্যতে অনেকে যখন দীক্ষা আমার মনোনীত স্থলাভিষিক্তদের কাছ হইতেই নিবে, তখন প্রত্যেকের মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী বা প্রাসঙ্গিক ভাবে যে যতটুকু পারে, ব্রহ্মচর্য্যকে ব্রত স্বরূপ করিয়া লইয়া পালন করিয়া যাইতে হইবে। একটী সপ্তাহ যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিয়াছে, জানিও, সে এক অশ্বমেধযজ্ঞের সুফল আহরণ করিয়াছে। একটী মাস যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছে, জানিও, সে শত রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনের সুকৃতি ও সুযশের যোগ্য হইয়াছে। তবে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের কথা প্রত্যেককে গোপনে রাখিতে হয়, নতুবা অনর্থ ঘটে। নিজেদের ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কৃতিত্বের কথা যাহারা দম্ভ সহকারে প্রচার করে, তাহাদের অতি সামান্য কারণে এবং স্বল্প সময়ে অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। ব্রতপালনের মহিমাকে মন্ত্রগুপ্তি দ্বারা সুপরিরক্ষিত করিয়া যে রাখিতে হয়, ইহা কদাচ ভুলিও না। আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৬ই আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের মা— এবং স্নেহের বাবা—, তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ৩রা আষাঢ়ের পত্র একেবারে ৬ই আষাঢ় পাইয়া যাইব, এমন ধারণা ছিল না। কিন্তু পত্র পাইবার পরে আফশোষ হইতেছে যে, তিন আষাঢ়ের পত্র ঐ তিন তারিখেই কেন পাইলাম না। তোমাদের পত্র পাইয়া আনন্দে বারংবার বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছি। হঠাৎ তোমরা দুই জনে আমার এত প্রিয় হইয়া গিয়াছ যে, মনে মনে ভাবিয়াছি, যেন তোমরা একেবারে শিশু হইয়া গিয়াছ এবং আমার দুই বাহুর বেষ্টন আশ্রয় করিয়া আমার দুই বক্ষপার্শ্বে আশ্রয় নিয়াছ এবং আমি তোমাদের দু ক্রোড়ে নিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছি। সংযমী দম্পতী আমার নিকটে এতই আদরের, এতই স্নেহের।

কতবার চেষ্টা করিয়াছ, কতবার বিফল হইয়াছ। এবার তোমরা পূর্ণ সংযম-ব্রতে সম্বৎসর বিনা বাধায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলে। চাহিয়াছ, চির জীবনের ব্রহ্মচর্য্য। অত বড় দায়িত্ব আমি এক নিঃশ্বাসেই দিয়া দিব না, তোমরা আগামী আর একটী বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ কর। আগামী বৎসরটী নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেলে আমরা পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব।

তোমাদের সম্বৎসর-ব্যাপী সংযম-পালনের সাফল্যে আমি এজন্য এত উৎফুল্ল হই নাই যে, তোমরা এই একটী যুগলই মাত্র এই অসাধ্য

সাধন করিলে, পরন্তু তোমাদের ন্যায় আরও যে সকল যুগল নানা স্থানে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে তোমরা দুজন নিজ নিজ ব্যক্তিত্বে একটু অধিক সমুজ্জ্বল। রূপে, গুণে, বিদ্যাবত্তায় সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ও জনহিতকর কর্ম্মে তোমরা দুই জনেই এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তোমরা একে অপরের প্রতি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের বস্তু। আকর্ষণ যখন অকল্পনীয় রূপে প্রবল হয়, রুচিমান্ সমাজের লোকদের ভিতরে দেহের যৌনমিলন তখন কাম-প্রেরিত নহে, স্বভাবেরই অনুবর্ত্তনকারী। তোমরা তাহার উপরে নিজেদের বিজয় স্থাপন করিয়াছ।

এতদিনের চেষ্টায় যে ব্রতে সম্বৎসরের জন্য সফল হইলে, সেই ব্রতের কথা বাহিরে ঘূণাক্ষরেও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না কিন্তু বিগত এক বৎসরের মনের দৃঢ়তাটী নিয়া সেই ব্রতকে প্রত্যহ প্রতিক্ষণে অটুট রাখিবার অনুশীলনে লাগিয়া যাও। অন্য হাজার বিষয়ে মানুষকে হিতোপদেশ দিয়া সৎপথাশ্রিত করিবার চেষ্টা করিলেও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" বিষয়টী সম্পর্কে তোমাদের রসনা যেন কদাচ মুখর না হয়। আমার পুথি-পুস্তক পড়িয়া যে যাহা জানিবার জানুক, তোমরা ঠিক এই বিষয়টী বাদ দিয়া অন্য সকল বিষয়ে সকলের মনে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া যাও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০
(২৮ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের মা ও বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিশ্বাস করিও, আমাকে পত্র লিখিয়া বিব্রত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যাহার যাহা বক্তব্য, দূর হইতে মনে মনে বলিলে আমি অধিকাংশ সময়ে তাহা টের পাই এবং তাহার প্রতীকারার্থ যাহা করা উচিত, অদৃশ্য ভাবেই তাহা করিতে পারি এবং করিয়া থাকি। কিন্তু আরও একটা কথা মনে রাখিও যে, আমি তোমাদের বর্ত্তমান নিয়া ততটা উদ্বিগ্ন নাই, যতটা আমি ভাবি তোমাদের প্রতিজনের ভবিষ্যতের কথা, তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যতের কথা, তোমাদের বংশে জাত নব নব প্রজন্মের কথা। সাধারণ মানব-জাতি দেবমানবজাতি রূপে উৎকর্ষিত হইবে, এই এক আশারূপ স্বপ্ন আমার নয়নের জ্যোতিকে আবরিয়া রাখিয়াছে। তাই আমি তোমাদিগকে বারংবার বলি, প্রকাশ্যে বলি, অপ্রকাশ্যে বলি, স্পষ্টতঃ বলি, ইঙ্গিতে বলি, যে যতটুকু পার, ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনকে নিজ নিজ জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। যে পূর্ণতঃ সফল হয় নাই, সেও কল্যাণকৃৎ বলিয়া পুণ্যভাক্ এবং প্রশংসা-ভাজন হইবে।

সভাস্থলে ভাষণ দিবার সময়ে কত মনোহারী করিয়া বাক্যাবলি বর্ষণ করি। তোমরাও ত দলে দলে বা সহস্রে সহস্রে মন্ত্রমুগ্ধবৎ

চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে বসিয়া শ্রবণ কর, উল্লসিত হও, পুলকিত হও, উৎসাহে কখনো কখনো ফাটিয়া পড় কিন্তু আসলে আমি তোমাদের কাছে কোন্ কথাটুকু বলিবার জন্য পরমায়ু ক্ষয় করিলাম, তাহা কি বুঝিয়াছ? আমি চাহি, প্রতিজনে তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন কর, যে পার না, সেও অল্প-কিছু কর, যে পার, সে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কর, তবু কর। আমি চাহি, বারংবার বিফল হইয়াছ বলিয়া কেহ হাল ছাড়িয়া দিবে না, যতবার বিফল হইয়াছ, তার দশগুণেরও অধিক বার চালাইবে সাফল্য-লাভের চেষ্টা, দমিয়া যাইবে না, পরাঙ্মুখ হইবে না, আত্মবিশ্বাস হারাইবে না। আমি চাহি যে, তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফলেই এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটী অর্জ্জন করিতে সমর্থ হও যে, চা, চুরুট, বিড়ি খাওয়া যেমন ইচ্ছা করিলেই পরিত্যাগ করা যায় এবং চা-চুরুট-বিড়ি না খাইয়াও মানুষ যেমন সুন্দর ভাবে চলিতে পারে, তেমনি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য জীবনেও একেবারে অনাঘ্রাত কুসুম-সম পবিত্র থাকিয়া নিশ্চয়ই চলিতে পার। এই প্রত্যয়ে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও যে, যাহা তোমরা করিতে অতি অবশ্যই পার, যাহা তোমরা হইতে সুনিশ্চিতই সমর্থ, আমি মাত্র তাহাই তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করিতেছি, ইহার অধিক কিছু নহে। ব্রহ্মচর্য্যকে আন্দোলন রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া হয়ত কেহ কেহ অবতার-বাদের বনিয়াদ শক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনকে ভাঁওতা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কেহ কেহ হয়ত জাতির ভিক্ষাপরায়ণ মনোভাবকে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। এরূপ অভিযোগ কাহারও কাহারও মুখে আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। আমি চাহি, তোমাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সুপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাটী এমন ভাবে

চলুক, যেন কেহ উক্ত রূপ অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করিতে না পারে। ব্রহ্মচর্য্য ব্যক্তিগত অনুশীলনের জিনিষ, ক্লাবে বা ময়দানে ইহা নিয়া প্রচারণা-গবেষণার অবসর নাই। কাহারও জীবনে ব্রহ্মচর্য্য সত্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাকে ঢেঁঢড়া পিটাইয়া প্রচার করিতে হয় না,—"আমি ব্রহ্মচারী।" কাহারও জীবনে স্বল্পমাত্র ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার চেহারার ছন্দ-বদল হইয়া যায়, তাহার চিত্ত-ভাবে স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তি খেলা করিতে থাকে, তাহার দেহের উদ্বেগ কমিয়া যায়, তাহার মনের বল বাড়ে, তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাস হয় অটল, অচল, অক্ষুণ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য এমন এক অমৃত, যাহার অল্প হইলেও মহৎ সুফল অবশ্যম্ভাবী।

আমি যখন তোমাদের বলি,—"সংগঠন কর", তখন তাহার মানে এই বুঝিও যে, নিজ নিজ জীবনে সীমিত ভাবে হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন কর এবং ব্রহ্মচর্য্যলব্ধ প্রজ্ঞার বলে কর্ম্মপথের নিশানা চিনিয়া ঘরে ঘরে যাইয়া জাগরণী বাণী প্রচার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৮০
(২৯ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—. তুমি এবং কল্যাণীয়া মা তথা পরিবারস্থ অপরাপর সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

৫

তোমার ঝোঁক একাকী দীক্ষার দিকে। আমার ঝোঁক সকলকে নিয়া একত্র দীক্ষার দিকে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বড়ই একাচোরা,—জীবনের অধিকাংশ ঘটনা আমার একা নিজেকে নিয়া, সব চেয়ে চমকপ্রদ ক্লাইমেক্স্‌গুলিতে আমি একাই নায়ক, কিন্তু আমার মনের ঝোঁক দশ জন, বিশ জন, হাজার জনকে নিয়া। তাই, যখন সামূহিক দীক্ষা স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন হইতে একক একটী ব্যক্তিকে আলাদা করিয়া দীক্ষা দিবার পক্ষপাত আমার কমিয়া গেল। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিরুচি বা অনভিরুচির কথা নহে, ইহা ভাবী বিশ্বকুশলের একটী ভূমিকা বা পরিপ্রেক্ষি বলিয়া আমি বুঝিয়া নিয়াছি। তোমার যখন একাকী আসিয়া দীক্ষা নেওয়াই ঝোঁক, তখন স্বভাবের উপরে উৎপীড়ন করিতে যাইও না, বরং কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখ যে, তোমার এই ঝোঁকের স্বাভাবিক ভাবেই কোনও পরিবর্ত্তন হয় কিনা। পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেলে ত ভালই হইল, কলিকাতার পরবর্ত্তী দীক্ষার তারিখটী জানিয়া নিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে দীক্ষামণ্ডপে সময়-মতন বসিয়া গেলেই হইল। তবে, সঙ্গে তোমার সহধর্ম্মিণীকে আনিও, অবশ্য যদি গুরুতর কোনও বাধার কারণ না থাকে।

ব্যক্তি এবং বিশ্ব পরস্পর হইতে দূরেও নহে, অসম্বদ্ধও নহে কিন্তু তথাপি এক হইতে অপরে আলাদা থাকিতে চাহে। ভূমি এবং ভূমার কলহ নাই, তথাপি একটা হইতে অপরটা যেন লক্ষকোটি যোজন দূরের পথ। ইহা আমাদের জন্মসংস্কারের মধ্যেই লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উপলব্ধির সুযোগ আসিলে দেখিয়া চমৎকৃত হইবে যে, একাকী দীক্ষা বা একাকী সাধন তত প্রয়োজনীয় নহে, সকলকে লইয়া দীক্ষিত হওয়া বা সকলকে লইয়া সাধন করিয়া যাওয়া যতটা প্রয়োজনীয়। তথাপি,

একত্রিংশতম খণ্ড

ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এক একটা আলাদা ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই তাৎপর্য্য আছে এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে যে ব্যবস্থা সঙ্গত, তাহা যথাকালে হইবে। দীক্ষার সময়কে সন্নিকটস্থ করিবার জন্য ব্যগ্রতা পোষণের চেয়ে দীক্ষাকে জীবনে সফল করিবার আশীর্ব্বাদ ও যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য অধিক প্রার্থনাপরায়ণ হও বাবা।

আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোনও জপতপ কর না বলিয়া কুণ্ঠিত হইও না। কোনও একটা প্রতীকের বা মাধ্যমের মধ্যবর্ত্তিতায় দিনের মধ্যে কোনও না কোনও সময়ে পরমেশ্বরকে বা তাঁর দিব্য বিভবিকে স্মরণ কর,— ইহা দ্বারাই তোমার অধ্যাত্মকর্ম্মের শুভসূচনা হইয়াছে। আপাততঃ নিষ্ঠার সহিত ইহাতে লাগিয়া থাক। ইহার ফলেই তুমি আস্তে আস্তে আগাইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

সকল স্বপ্নই স্বপ্ন কিন্তু কোনও স্বপ্নই নিষ্ফল নহে। স্বপ্ন অধিকাংশ সময়ে তোমার আমার অজ্ঞাত জগতের বার্ত্তাবহ। সে বার্ত্তার "কোড্" সকল সময়ে ভাঙ্গানো সম্ভব হয় না। ভাল স্বপ্নই দেখিয়াছ। ইহা মিথ্যা হইবে কেন? দিনে দেখিলেই স্বপ্ন মিথ্যা হইবে আর রাত্রে দেখিলেই তাহা সত্য হইবে, এরূপ ধারণার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন কি? সমগ্র জীবনটাই একটা সুদীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন, তবু ইহার ভিতরের আনন্দ, রস, তৃপ্তি, প্রসাদটুকুকে কত আদর করিয়া স্বীকার করিয়া নিতেছি। বড় স্বপ্নও যতখানি সত্য, ছোট স্বপ্নও ততখানি সত্য হইতে পারে। কার্য্যানুক্রমে তাহার কি ব্যাখ্যা প্রকটিত হয়, দেখিবার জন্য প্রতীক্ষায় থাক।

আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল জটিল সমস্যার জটাজাল দ্রুত ছিন্ন হউক, মনে ও সংসারে শান্তি স্থাপিত হউক। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে স্নেহ ও আশিস নিও। সকল সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। লিখিয়াছ, তোমাদের ওখানে কর্ম্মী আছে। এই সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। লোক ত সব জায়গাতেই গিজ্‌গিজ্ করিতেছে এবং কোনও স্থানেই হুজুগেরও অন্ত নাই কিন্তু অভাব ত দেখিতেছি শুধু কর্ম্মীর। তোমাদের যখন এই দুর্ল্লভ জিনিষটীর অভাব নাই, তখন আমি কাজের প্রয়োজন অর্থ-ব্যয়কে মোটেই গ্রাহ্য করিব না। কিন্তু একটা ভয় আমার এই আছে যে, যখন দেখা যাইবে যে, কাজ করিবার জন্য অর্থের অভাব নাই, তখন আবার এত কর্ম্মী আসিয়া ভিড়িয়া না পড়ে, যাহাতে সকলের পায়ের দাপাদাপিতে আমার সঙ্ঘতরণীর পাটাতন ভাঙ্গিয়া গিয়া নদীর স্রোতে না ভাসিয়া যায়। এই বিষয়ে সতর্ক হইয়া যদি কাজ করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতই তোমাদের প্রতিটি পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের, সঞ্চয়ের ও প্রেরণের চেষ্টা করিব। * * * অনাবশ্যক স্থানকে কর্ম্মক্ষেত্র রূপে নির্ব্বাচন করিবে না, অনাবশ্যক লোককে সঙ্গে নিবে না, সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নিজেদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম্মও সুকৌশলে করিয়া নিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে কদাচ সঙ্গী বা অনুগামী হইতে দিবে না। এভাবে যদি কাজ করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই সুফল হইবে এবং সেই ফল স্থায়ী হইবে।

আর একটা বিষয়ে আমি তোমাদের বারংবার বলিতেছি যে, যাহারা প্রচার বা সাংগঠনিক কাজের জন্য নানা কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবে,

তাহারা যেন নিজ নিজ জীবনে অতীব গোপনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইবার চেষ্টায় সর্ব্বদা অবহিত থাকে এবং নিজেদের মাহাত্ম্যের বাহাদুরীতে কোথাও প্রমত্ত না হয়। অতীতের অনেক সম্মানিত কর্ম্মীকে তোমরা লোকচক্ষে হেয় হইয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছ এবং বুঝিয়াছ যে, সব ব্যাপারে মেকী মাল চলে, এই ব্যাপারে তাহা চলে না॥ তোমরা প্রকৃত আদর্শবান্ ও নীতিনিষ্ঠ থাকিয়া তবে মানুষকে আদর্শের দিকে নীতিপালনের দিকে আহ্বান করিবে। পরনিন্দা পরিহার করিবে, ভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘের অনুগামীদের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিবে কিন্তু নিজ আদর্শের প্রতি আনুগত্যহীনতাকে কদাচ প্রশ্রয় দিবে না। অপর-মতাবলম্বীরা তোমাদের আদর্শের নিন্দা করিলে উত্তেজিত হইবে না কিন্তু তোমাদের গুরুভাইদের মধ্যে যদি নিজেদের আদর্শের নিন্দা শুনিতে পাও, তবে জানিও, শয়তান সশরীরে তোমাদের সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে সশস্ত্র সতর্কতা তোমাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর কাহারও সহিত বিরোধ করিব না বলিয়া পণ করিয়াছি বলিয়াই নিজেদের ভিতরে নিন্দনীয় আচরণকে বিনা শাসনে রেহাই দিতে হইবে, ইহা একটা যুক্তিই নহে।

মনে রাখিও, যাহারা বেশী কথা কহিবে, তাহারা কাজ কমই করিতে পারিবে। কথা দিয়া কাজের মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না, কাজ দিয়াই কথার দাম কষিতে হয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ আষাঢ়, ১৩৮০

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে স্নেহ ও আশিস নিও। আমার স্নেহ আমার আশিস সকল সময়ে প্রাণভরা আর মনভরা হয়। সুতরাং পত্র লিখিবার কালে ঐ দুইটী গালভরা সুশ্রাব্য শব্দ লিপিবদ্ধ করি নাই বলিয়াই অভিমান করা উচিত নহে যে, তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ-ভালবাসা, আদর-দরদ, সম্প্রীতি ও আশিসের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। আমার স্নেহ ক্ষীরবৎ ঘন বলিয়া তরলাকারে তাহার প্রকাশ নাই। ভেজাল না মিশাইলে এই স্নেহকে তরল করা যাইবে না। পত্র লিখিলে তাহার শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য না দিয়া তাহার মর্ম্মের দিকে দৃষ্টি দিও। মর্ম্ম কিছুই বুঝিলে না ত' শুধু শব্দের ঝঙ্কারে তুমি বৈতরণী পার হইয়া যাইতে পারিবে নাকি ?

তোমরা ত বাবা সমাজসেবা করিতেছ। আসলে কি করিতেছ! কতকগুলি ছাপান ফর্ম্মের শূন্য স্থানগুলি মানানসহি কতকগুলি অঙ্ক বা উক্তি দিয়া ভরিয়া দিতেছ। কিন্তু সমাজসেবা ফর্ম্মের জিনিষ নহে, উহা মর্ম্মের জিনিষ। তোমরা কি সেই মানুষগুলির মর্ম্মকে চিনিতে পারিয়াছ বা মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারিতেছ, যাহাদের সেবা করিতে ব্রতী রহিয়াছ বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি ?

আজ একটী অপরিচিত ভক্ত মহিলার মর্ম্মবেদনার ইতিকথা পাঠ করিয়া আমার মনে অশান্তির ঝড় সুরু হইয়াছে। এই দেশেই আমরা বলিয়াছিলাম,—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ—যেখানে

নারীর হয় পূজা, সেখানে দেবতারা আনন্দে মাতেন।" কিন্তু নারীর জীবনে প্রত্যহ প্রতি দিক হইতে এত অত্যাচার, এত লাঞ্ছনা, এত অপমান আসিতেছে, যাহার বিবরণ শুনিলেই হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক বিখ্যাত শহর হইতে একটী মহিলা বারাণসীতে ছুটিয়া আসিয়াছিল ক্ষতবিক্ষত দেহে প্রহার-চিহ্ন বহিয়া। একদিকে একদল নারী তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার স্পর্দ্ধা লইয়া নিজ স্বামীকে বাহিরের লোক দিয়া প্রহার করাইতেছে, অন্য দিকে একদল পুরুষ নিরপরাধা নারীকে লাঞ্ছনা, অপমান, গঞ্জনা, অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা দগ্ধিয়া মারিতেছে। ভালবাসিয়া যাহারা একে অন্যকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পর্যান্ত কল্পনাতীত অশান্তির অগ্ন্যুৎক্ষেপ অবিরাম চলিতেছে। ইহাতে ঐ নির্দ্দিষ্ট একটী নারী বা নির্দ্দিষ্ট একটী পুরুষই জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে না, সমগ্র পরিবার, বংশাবলির ভবিষ্যৎ অবতংসগণ এবং সমগ্র সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। তোমাদের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া অত্যাবশ্যক জানিও।

স্বামী তাহার পত্নীর কাছে স্বাভাবিক ভাবে যাহা প্রত্যাশা করিতে পারে আর পত্নী স্বামীর কাছে স্বাভাবিক ভাবে যাহা দাবী করিবার অধিকারী, তাহা তাহাকে দিতেই যে হইবে, এই কর্ত্তব্য-বোধটুকুর শিক্ষা কেহ ত কাহাকেও দেয় নাই। পত্নীর নিকটে যাহা প্রত্যাশা করা স্বামীর অনুচিত বা পতির নিকটে স্ত্রীর যাহা দাবী করা অসঙ্গত, তাহার প্রত্যাশা ও দাবী হইতে নিজেকে নিরস্ত রাখার যোগ্য সংযমের শিক্ষাটী না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করিবারই যে কাহারও অধিকার হয় না, এই কথা কে কবে নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দিয়াছে? তোমরা সমাজ-সেবকের দল কি এই কার্য্যভারটুকু গ্রহণ অনাবশ্যক মনে কর? কেবল

ফর্ম্ম ফিল্-আপ করা আর ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ কষা দ্বারাই কি প্রকৃত সমাজ-সেবা হইবে ?

খুব ধূমধাম করিয়া বিবাহ হইল, বধূ বহু প্রত্যাশা নিয়া পতিগৃহে ঘর করিতে গেল। দেখিল, স্বামীর বন্ধুদের নিয়া তাস-পাশার আড্ডা বসিয়াছে, তাহাতে সভানেতৃত্ব করিতেছেন জুয়া-মহারাজ। স্ত্রীর উপরে দাবী করা হইল যে, স্বামীর সুহৃদ্গণের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তাম্বূল আর চা বিতরণেই মনোরঞ্জন-পর্ব্ব শেষ হইল না, অকারণে হাসিতে হইবে, খুশীতে "হল্" ভরিয়া দিতে হইবে, গান গাহিতে হইবে, বিদ্যাটা জানা থাকিলে একটু নাচিতেও হইবে এবং সর্ব্বোপরি দুই-এক দান জুয়া খেলিতে হইবে। তারপরে যদি মদিরা আসিয়া অধর স্পর্শ করে এবং মত্ততা আসিয়া দেহকে অবশ করে, তখন ? সে চিন্তা পরের। এখন তাহাকে পতিদেবতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। ইহা কি বিবাহ, না দাসত্ব ? মধ্যযুগের ক্রীতদাসীরা হয়ত এর চেয়ে ভাল ছিল।

নানা স্থানের নানা রকমের এতগুলি দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে যে, কোন্টা নিয়া মন্তব্য করিব আর কোন্টা বাদ দিব, নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়াছে। এজন্য বিস্তারিত লিখিতে বিরত হইলাম।

ফোঁড়া দেখিলে নিশ্চয়ই জোঁকমারির প্রলেপ দিতে হয়। কিন্তু ফোঁড়াটী কেন হইল তাহার সন্ধান লইয়া মূল কারণকে দূর করিতে না পারিলে এই দেহে পর পর আরও বহু বিস্ফোটকের জন্ম হইবে। সমগ্র সমাজ-দেহের রোগের মূল কারণ আদর্শচ্যুতি; দুরন্ত ভোগবাদ, ব্যক্তিগত সুখের প্রতি অত্যাসক্তি এবং প্রাচীন ঋষিগণের প্রদত্ত অধিকাংশ হিতোপদেশের প্রতি অবজ্ঞা। কেবল টাকা খরচ করিয়া আর রিপোর্ট

লিখিয়া সমাজের এই বিপত্তি যে ঠেকানো যাইবে না, ইহা বুঝিয়া তোমরা তোমাদের কর্ম্মে নবসঞ্জীবনা সঞ্চারণের প্রয়োজনকে অবিলম্বে উপলব্ধি কর, এইটাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৪ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * সুমহতী সাধনার-ফললব্ধ একটী অমূল্য ধন হইতেছে ঐক্য। সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলে, দাঁড়ানো হইতে এক সঙ্গে বসিয়া পড়িলে, এক সঙ্গে একই সময়ে বিগ্রহকে বা প্রণম্যকে প্রণাম করিলে, তাহা দ্বারাও ঐক্যের অনুশীলন হইয়া থাকে। সকলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রণামী একটী স্থানে জমা দিলে তাহা দ্বারাও ঐক্য বর্দ্ধিত হয়। কিসে ঐক্য বর্দ্ধিত হয়, তার দিকে তাকাইয়াই ত আমি তোমাদিগকে নানা বিধি-ব্যবস্থা দিতেছি। তোমরা তাহা অনুসরণ করিলে অভিলষিত সুফল অবশ্যম্ভাবী।

ত্যাগ মানুষের সহজে আসে না। চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই ত্যাগ আসে। অশুদ্ধচেতা লক্ষপতি কোটিপতিদের নামযশোহীন সৎকর্ম্মে এই জন্যই কোনও রুচি দেখা যায় না। তোমরা নিরন্তর ভগবানের নাম-সেবা করিয়া করিয়া নিজেদের চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার অপসংস্কার হইতে প্রমুক্ত

করিয়া ফেল। দেখিবে, পৃথিবীতে দরিদ্রেরাই সব চেয়ে বড় কাজটা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে নিরন্তর এই আশীর্ব্বাদই করি যে, তোমরা প্রতিজনে সাধন-পরায়ণ হও। তোমাদের কাছে আমার আর কিছু প্রত্যাশার বস্তু নাই। তুমি সাধন করিলে কেবল তোমারই চিত্তশুদ্ধি ঘটিবে, তাহা নহে, চতুর্দ্দিকের পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। পারিপার্শ্বিক পঙ্কিলতার অপপ্রভাবে আজকালকার কচি ছেলেমেয়েগুলির অকালেই সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। সেই সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে এবং জাতিকে ত তোমরাই মা বাঁচাইবে। আমি আকুল আগ্রহে তোমাদের সাধনলব্ধ শুদ্ধতা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রতীক্ষা করিতেছি। এই জন্যই বলি, উপাসনায় প্রতিজনে যোগ দাও, সময় মত যোগ দাও, প্রতি সপ্তাহে যোগ দাও, একসঙ্গে প্রণাম কর, এক সঙ্গে অঞ্জলি দাও, এক সঙ্গে স্তোত্রপাঠ কর। এক সঙ্গে সকলে সকল কাজ করিতে পারা একটা বড় রকমের কৃতার্থতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিলাম। তোমার কাজের বিবরণ অবগত হইয়া খুবই খুশী হইয়াছি। অন্য লোকেরা আসিয়া মণ্ডলীর মধ্যে গোলযোগ করিবে, এই ভয়ে তুমি মণ্ডলী হইতে দূরে যাইতে পার না। তোমার কর্ত্তব্য সম্পর্কে তুমি অবহিত থাক এবং অন্যান্যদিগকে যত ইচ্ছা বাহাদুরি করিতে দাও। পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহারা নিজ নিজ সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারাই সৎপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে ঢুকিয়া নানা প্রকারের গোলযোগ সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করে। এইরূপ ঘটনা আমি অনেকগুলি দেখিয়াছি।

* * * *

মণ্ডলীর ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে দিও না। অহঙ্কার বাড়িলে, এবং ইষ্টনিষ্ঠা কমিলে, সাংসারিক অশান্তিগ্রস্ত দুর্জ্জন কুটিলেরা সদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া এক প্রকারের পৈশাচিক আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের লক্ষ্য সমাজ-কল্যাণ নহে,—কিছু বাহাদুরি করা মাত্র। কোনও সজ্জন-সংঘে এমন অহংপ্রমত্ত ব্যক্তিদের স্থান থাকা উচিত নহে। নিজেদের সুবিধামত ইহারা গুরু-ভক্ত বা গুরুদ্রোহী হয়।

* * *

যে ভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছ, সেই ভাবে কাজ চালাইয়া যাও। তোমাদের কর্ম্মের অকপটতা ও নিষ্কলুষতা আস্তে আস্তে তোমাদিগকে সঠিক পথে টানিয়া লইবে। কাজ দ্রুত করিবার জন্য মিথ্যার সহিত বা পাপের সাথে মিতালি করিও না।

নূতন কর্ম্মী সৃষ্টি হওয়া একটা শক্ত ব্যাপার। দেশের বড় বড়

মাথাওয়ালা লোকেরা এমন সব কুদৃষ্টান্ত গায়ের জোরে স্থাপন করিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের সৎকর্ম্মে রুচি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইঁহারা যত বেশী কথার দাপট বাড়াইতেছেন, ততই আমরা দেখাদেখি অধিকতর বাক্‌সর্ব্বস্ব হইতেছি। অন্য জাতির খবর জানি না কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে আমি যতটা জানিয়াছি, তাহাতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি যে, এ জাতির মাথার মণিগুলি প্রায় সবই নকল হীরা। তাহা না হইলে এ জাতির যুবকগুলি, এমন কাঁচা তরুণ টাটকা প্রাণগুলি আত্ম-দ্বন্দ্বের গুপ্ত হত্যায় চৈত্র-সংক্রান্তির ছাতুর মতন বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারিত না। সুতরাং সৎপ্রতিষ্ঠানের জন্য নামযশোলোভহীন নীরব নিষ্কাম কর্ম্মী কোথায় পাইবে? কিন্তু যাহারা এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী জাতির শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে অবিচল ধৈর্য্যে প্রতীক্ষাই করিতে হইবে। হতাশ হইলে চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুনকী
১৫ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮০
(৩০ জুন, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রেরিত কাজু বাদাম পাইলাম এবং উৎকৃষ্ট রূপে ধৌত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরে নিবেদন করিয়া সদ্ব্যবহার করিলাম।

এখানে কোনো ডাকের মাল এত তাড়াতাড়ি আসে না। তোমারটা আসিয়াছে দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। ইহা তোমার অকপট ভক্তির ফল হইতে পারে।

তোমাদের আত্মিক ও সাংঘিক কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে যে যে অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা আমি দূর হইতেই অনুভব করিতেছি। দশজনে মিলিয়া যে কাজ করিতে হইবে এবং যে কাজের উদ্দেশ্য দশজনের হিত, সেই কাজে প্রত্যেককে অভিমান বর্জ্জন করিতেই হইবে। আত্মাভিমান বা কর্ত্তৃত্বলিপ্সা প্রবল হইলে তোমাকে কাজ করিতে হইবে একা একা, দশজনের সহযোগিতার স্পর্শ পাইয়া উঠিবে না। নিজের যোগ্যতা যতই অধিক হউক, নিজেকে কতকটা খাটো করিয়া না নিলে অন্যেরা তোমার সঙ্গে কাজ করিতে সুখ পাইবে না। এই কথাটী তোমার, আমার এবং অপর সকলের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা প্রয়োজন।

তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে অনেক উত্তম আধার আছে। তাহাদের আধ্যাত্মিক চেতনা, সাংঘিক কর্ত্তব্যবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা, সৎকর্ম্মে সৎসাহস সঞ্চয় এবং অনলস নিষ্ঠা নিয়া একই কাজে লাগিয়া থাকার সদ্‌গুণগুলির বিকাশ-সাধনের জন্য নিয়ত অনুশীলন ও প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। প্রত্যাসন্ন সম্মেলনে তোমরা তদ্বিষয়ের উপায় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
হরিওঁ
১৫ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গাত্রমার্জ্জনে, অবগাহনে বা বস্ত্রপরিবর্ত্তনে মানুষ নিজেকে শুচিতর মনে করে। এই জন্যই পূজার্চ্চনা বা উপাসনাদি করিবার আগে এগুলি করিয়া নেয়। রজঃপ্রবৃত্তিতে, মুত্রাগমে, মলবেগে বা শুক্রপাতে মানুষ অপবিত্র হইয়া থাকে, এজন্য গাত্রমার্জ্জন, অবগাহন ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া কেহ মাঙ্গলিক বা আর্চ্চনিক কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। যাহাদের এমন অসুখ আছে যে নিয়তই ধাতুক্ষয় বা রজোনিঃস্রাব, মূত্রপাত বা এই জাতীয় উৎপাত হয়, তাহাদের পক্ষে উপাসনাদির ভোগ-নৈবেদ্য সাজা, চন্দন-ঘষা, বিগ্রহ-পরিমার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম না করাই সঙ্গত।

জাতকাশৌচ সম্পর্কে উদার হইবে। বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করিলে প্রসূতি এবং আতুর ঘরে যাহারা যায় ও থাকে, তাহারা ছাড়া আর কেহ অশুচি হয় না। মৃতাশৌচ সম্পর্কে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিলে আমার দিক দিয়া আপত্তি নাই কিন্তু একদিকে সামাজিক নিয়মে অশৌচ পালিবে, অপর দিকে আমাদের নিয়মে বিগ্রহসেবা করিবে, এভাবে দু-নৌকায় পা রাখা চলিবে না। আমার মতে, কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধাধিকারীদের অশৌচ থাকিবে কিন্তু মৃতদেহের সৎকার হইয়া যাইবার পর হইতে একমাত্র শ্রাদ্ধাধিকারিগণ ব্যতীত অন্যের অশৌচ পালন এই যুগে অকারণ। অতীতে সাত গোষ্ঠীর সকলের ইহা মানিবার

যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যাহার অশৌচ নাই, সে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে বিগ্রহের সেবা-পূজা করিতে অধিকারী।

রজোমতী হইলে স্ত্রীলোককে একেবারে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়। এই নিয়ম নিন্দনীয় নহে। রজোদর্শনের চারি দিন পার হইলেই সে আর অস্পৃশ্য থাকে না। রজোমতী অবস্থায় নারীর পক্ষে ভোগ-নৈবেদ্য তৈরী করা বা বিগ্রহে অঞ্জলি দেওয়া নিষিদ্ধ আছে। এই নিয়ম মানা ভাল। চারিটা দিন দূরে থাকিয়া প্রণাম করিলে ক্ষতিটা কি? তোমরা জান না কিন্তু আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, অধিকাংশ খ্রীষ্টান রজোমতী পত্নীকে প্রথম দশটী রজনী বর্জ্জন করিয়া চলেন। আমার মতে, ইহা খ্রীষ্টানদের পক্ষে প্রশংসার। রজোমতী নারীকে লইয়া মাখামাখি বর্ব্বরতার লক্ষণ।

যে সকল নারী রজোরোগে আক্রান্ত, তাহাদের রজোদর্শনের বা রজোবিরতির কোনও নির্দ্ধারিত সময় নাই। এই সকল ক্ষেত্রে পূজার্চ্চনাদির আয়োজনে প্রত্যক্ষ ভাবে সব করিতে না গিয়া অপরকে দিয়া করাইবার অভ্যাস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। যে সকল পুরুষের ঘন ঘন মূত্রবেগ বা শুক্রবেগ হয় বলিয়া ঘন ঘন বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন পড়ে, তাহাদেরও জিদ করিয়া এসব কাজ করিবার চেষ্টা উচিত নহে। প্রত্যেককেই নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ চড়াইতে হইবে, এমন কোন্ কথা আছে? ভগবানকে অবিরাম ডাকিতে ডাকিতে এমন রোগীরা অনেকে যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং রুগ্নকে নিজ গণ্ডীর ভিতরই থাকিতে দাও। কতকগুলি অসুস্থতা আছে, যাহা শরীরকে সত্যই অপবিত্র করে। একজন বসন্ত-রোগীকে বা কলেরার রোগীকে কি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ-নৈবেদ্য

তৈরী করিতে দিবে? একজন কুষ্ঠ-রোগীকে? নিয়ত-শ্বেতস্রাবের রোগিণীদিগকে রোগারোগ্যের আশায় অনেক সময়ে ছুটিয়া ঠাকুরের রান্নার উনানের দিকে যাইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন বিপজ্জনক, অন্য দিকে তেমনই আপত্তিজনক। অবোধ লোকেরা একথা বোঝে না বলিয়াই মনে কষ্ট পায়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার গৃহে ভগিনী-সম্মেলন হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীওঙ্কার-বিগ্রহের পাদমূলে অঞ্জলি প্রদানের পরে কিছু অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়াছিল বলিয়া ভীত, বিষণ্ণ, উৎফুল্ল, উত্তেজিত, আত্মহারা বা বল্গাহীন হইও না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা চারিদিকে প্রচার করিয়া তোমাদের সঙ্ঘের সম্মান বাড়াইবার চেষ্টা কেহ করিও না। সমবেত উপাসনা-কালে আমার জন্য রক্ষিত আসনখানাতে আমি আসিয়া যে বসি এবং তোমাদের প্রতিজনের সঙ্গে যে সত্যই সমবেত উপাসনা করিয়া যাই, এই কথাটী তোমাদের নিকটে প্রমাণিত হইল মাত্র। যাহা বর্ণনা দিয়াছ, তাহা প্রচলিত যুক্তিশাস্ত্রের বহির্ভুত ব্যাপার বলিয়াই তাহাকে ভূতুড়ে কাণ্ড বলিয়া ভীত হইবার প্রয়োজন

নাই। যদি কেহ গিয়া থাকে, যদি কেহ কিছু করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ত আমি ছাড়া আর কেহ নহে। যতকাল তোমরা নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া সমবেত উপাসনায় বসিবে, ততকাল আমি উপাসনা কালে তোমাদের সঙ্গে এই ভাবে থাকিব। এই ভাবে অনন্ত কাল থাকিব বলিয়াই ত সমবেত উপাসনায় সময়ে পূজার আসনে নিজের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে তোমাদিগকে দেই নাই। আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যেদিন থাকিবে না, সেই দিনও আমি প্রতিটি সমবেত উপাসনায় এই ভাবেই তোমাদের সঙ্গ করিব, তোমাদিগকে সঙ্গ দিব। তোমরা প্রতিজনে সমবেত উপাসনার প্রতি দিনের পর দিন আরও অধিক রুচিমান্, নিষ্ঠাশীল ও অনুরাগী হও। একা আমাকেই নহে, সমগ্র বিশ্বকে বুকে পাইবার ইহাই উপায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১৬ আষাঢ়, রবিবার, ১৩৮০

(১ জুলাই, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রমধ্যে তোমার মতিচ্ছন্ন স্বামীর ঠিকানাটী ত পাইলাম না। অবশ্য, আমি চিঠি লিখিলেই সে তাহার বাঞ্ছিতা নারীকে ছাড়িয়া সুড়্‌সুড়্ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবে, এমন দুরাশা আমি করি না।

তথাপি পত্র আমি তাহাকে লিখিব এবং আজ না হউক কাল, একদিন না একদিন আমার পত্র তাহার মনের উপরে নিশ্চয়ই কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়া করিবে।

ঘরে অনুগতা পত্নী থাকিতেও যে কোনো কোনো পুরুষ বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তাহার মধ্যে একটা মনস্তত্ত্ব আছে। একদল পুরুষ আছে, যাহাদের ইন্দ্রিয়-লিপ্সা প্রবল হইলেও তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল একটী ভাবাবেগ আছে, যাহার নাম জয়েচ্ছা। তাহারা অনাঘ্রাতা নারীকে, অপ্রাপ্যা বান্ধবীকে, অলভ্যা সুন্দরীকে জয় করিতে চাহে। অনেক বিপথগামী পুরুষের পদস্খলনের ইহা গুপ্ত রহস্য।

তুমি নিজের ভিতরে প্রবল সঙ্কল্প স্থাপন কর। তুমি অবিলম্বে এই বহির্গামী স্বামীর নিকটে অলভ্যা হও। তুমি জোর করিয়া নিজের দেহে ও মনে ব্রহ্মচারী হও। উন্মার্গগামী স্বামী ঘরে কদাচিৎ ফিরিয়া আসিলে তোমাকে যতই পদাঘাত করুক, তাহাকে দেহদান হইতে একেবারে বিরত হইয়া যাও। সে বুঝুক যে, মারিলে বা কাটিলেও তোমাকে বশীভূত করা যায় না, তুমি বশীভূত হইবে একনিষ্ঠ প্রেমের কাছে। অনেক লাঞ্ছনাই ত জীবনে সহিয়াছ মা, সাহস করিয়া আর একটুকু লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হও। দেখিও, ইহার ফল শুভ হইবে।

তোমার দগ্ধোদর পুত্রকন্যাগুলির কথা ভাবিয়া মনে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। কিন্তু তোমার স্বামীকে সংশোধিত করিবার জন্য আজ তোমার বগলামুখী মূর্ত্তি ধারণ আবশ্যক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৬ আষাঢ়, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। এখনি চাশ-বাজারে ট্যাক্‌সি ডাকিতে লোক যাইবে, কারণ দুই ঘণ্টা পরে ধানবাদ এবং ছয় ঘণ্টা পরে ট্রেণে বারাণসী রওনা হইব। এমন একটা ব্যস্ততার মুহূর্ত্তে তোমার উত্তেজনা-জনক বিবরণে পূর্ণ পত্রখানা হাতে পড়িল। এখনি আমি তোমাদিগকে কোনও সিদ্ধান্ত জানাইতে যাইতেছি না। আমি বরং উপদেশ দেই যে, তোমাদের কথিত স্ত্রী-লোকটীর মতন যাহারা উগ্র ধর্ম্মদ্বেষী নহে, কাজ মাত্র তাহাদের ভিতরেই কর। অপজাত, কুজাত, নিম্নজাত অনাদৃতদের মধ্যে কাজ করিতে গিয়া অনেক অতিরথ, মহারথ এবং ধুরন্ধর সমাজ-কল্যাণকামীদেরও বারংবার অনেক অপঘাত পাইতে হইয়াছে। তাঁহারা কেহই প্রতিশোধ-পরায়ণ হন নাই। তাঁহারা ক্ষমাই করিয়াছেন আর কাল-প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বংশানুক্রমে যাহারা নিজের দোষে বা পরের অত্যাচারে হেয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে গেলেও এইরূপ অনাহূত বা অপ্রত্যাশিত উৎপাত আসিবে বা আসিতে পারে। তাহাতে চঞ্চল না হইয়া তোমরা অন্য লোকদের ভিতরে তোমাদের কাজ করিয়া যাও।

কাহারও মাতা কোনও গুরুতর ধার্ম্মিক বা সামাজিক অন্যায় করিলেও পুত্রকে মাতার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া বিধিসঙ্গত নহে। পাপিষ্ঠা হইলেও জননী জননীই। তোমরা এই পুত্রটী সম্পর্কে

একেবারে নির্ব্বিকার থাক কিন্তু ধর্ম্মের অবমাননাকারিণী এই মাকে তোমাদের অনুষ্ঠান সমূহে এখন আসিতে দিও না। পরমেশ্বরের কৃপায় একদিন ইহার সংশোধন নিশ্চয়ই হইবে এবং তখন এই নিন্দিতা মা তোমাদের বন্দিতাও হইতে পারেন। তাহার বিরুদ্ধে অপকথা প্রচার করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইতে তাহাদিগকে বিরত কর, কুকথা কহিবার সুযোগ পাইলে যাহাদের মুখ বুনো ওলের সংস্পর্শ লাভে চুলচুল্ করে। তাহার সম্পর্কে ভালমন্দ সব কথাই তোমরা বর্জ্জন কর, মনে কর যেন এই নামের একটী স্ত্রীলোক এই গ্রামে নাই বা কখনো ছিল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮০
(১৪ জুলাই, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমগ্র দেশ জুড়িয়া প্রায় প্রত্যেকেরই জীবন-সংগ্রাম বড় নিদারুণ অবস্থায় চলিয়াছে। এ যুদ্ধ একা তুমিই দিতেছ না। আরও শত শত সহস্র সহস্র জনের একই সমস্যা। এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া

যদি সাধ্যমত কতক লোকও সততার সহিত শ্রম করিয়া যায়, তবে, আমার বিশ্বাস, প্রতিকারের সহজ পথ বাহির হইতে পারে। হিংসা হিংসাকে প্রশ্রয় দিবে, মানুষের আসল উদ্দেশ্য ভুলাইয়া দিবে,—এমন দুর্ঘটনা ঘটা কিছুই বিচিত্র নহে।

তুমি লিখিতে ভালবাস। লিখিতে ভাল প্রায় অধিকাংশ যুবকই বাসে। কিন্তু পত্রিকাওয়ালারা যে লেখা তাহাদের কাজের উপযোগী, তাহাই মাত্র ছাপিতে সমর্থ। তাঁহাদের কাগজের পাতা সীমাবদ্ধ। তাঁরা ভাল জিনিষটী পাইলে, নীরস জিনিষটী ছাপিবার স্পৃহা বোধ করেন না। এক এক পত্রিকার এক একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেই পত্রিকার উদ্দেশ্যের অনুযায়ী লেখা পাইলে স্থানে কুলাইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাহা ছাপিবেন, এভটা ভদ্রতা তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে করা চলিতে পারে। বৃথা তাঁহাদের উপরে রাগ করিয়া মনকে রুগ্ন বা রুষ্ট করিয়া লাভ নাই।

অনেকেই মনে মনে ভাবে যে, তাহারা যখন জনকল্যাণের চিন্তা করিতেছে, তখন তাহাদের চিন্তাগুলি সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেই জনসমাজে নবজাগরণ আসিবে। এই ধারণার গোড়ায় একটা মস্ত বড় গলদ এই রহিয়াছে যে, এদেশে পড়িতে জানে অতি অল্পসংখ্যক লোকে। তোমার মুখের কথা নিতান্ত নিরক্ষরেরাও বুঝিতে পারিবে। সুতরাং জনকল্যাণের আগ্রহ থাকিলে ঐ সকল নিরক্ষরদের কাছে গিয়া মুখের ভাষা দিয়া কথা শুনান আগে প্রয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ঐ সকল নিরক্ষরের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা। এই সহজ সরল কথাটা বুঝেন বলিয়া কখনো কখনো খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় লেখককেও দুর্গম পল্লীতে গিয়া কথা শুনাইয়া আসিতে দেখা যায়।

এই সহজ সরল কথাটা বুঝে না বলিয়াই অসংখ্য লোককে কেবল বহি লিখিতে, ছাপাইতে এবং গুদামের মধ্যে পোকায় কাটাইতে দেখা যায়। অনেক অনেক বড় লেখকই প্রথম জীবনে অনেক পত্রিকায় পাত্তা পান নাই। অনেককে নিজের লেখার তাগিদে নিজের পত্রিকা বাহির করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় তোমার লেখা কোনও পত্রিকা ছাপাইল না বলিয়া দুঃখ করিবে কেন? আমি বিপিনচন্দ্র পালের খুব ভক্ত কেন জানো? তিনি অজস্র লিখিয়াছেন কিন্তু মুখের কথায় বলিয়াছেন তাহার হাজার গুণ। বিপিনচন্দ্র পালের একটা বক্তৃতার মধ্যে যত ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও গবেষণা থাকিত, তাহা অনেক লেখকের সারা জীবনের লিখিত বিষয়ের চেয়ে বেশী। আমরা নিজ কর্ণে সেই কম্বুকণ্ঠের বক্তৃতা বহুবার শুনিয়াছি বলিয়াই এত তেজের সঙ্গে মন্তব্যটা করিতে পারিলাম।

লিখিবার চর্চ্চা ছাড়িও না। কিছু কিছু করিয়া প্রত্যহই লিখিও। এখন তোমার শিক্ষানবীশ অবস্থা। যাহা লিখিবে, তাহাই বেদময় হইয়া যাইবে, এত দক্ষতা অর্জ্জন কর নাই। সুতরাং অল্প অল্প লিখিবার সঙ্গে বেশী বেশী করিয়া ভাল লেখকের লেখা পড়িও। পড়িতে পড়িতে লিখিও, লিখিতে লিখিতেও পড়িও। আস্তে আস্তে নিজের লেখার ত্রুটিগুলি নিজের কাছে ধরা পড়িবে, কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়িবে এবং বিষয়-নির্ব্বাচনে নিপুণতা আসিবে। তখন লেখা দামী জিনিষ হইবে, তখন আস্তে আস্তে সকল পত্রিকাই তোমার লেখা আদর করিয়া নিবেন এবং হয়ত লেখার জন্য পয়সাও দিবেন। যে-কোনও বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সময় লাগে। হাতে খড়ির পরের দিনই কেহ এম-এ পাশ করে না।

আমি হিতবুদ্ধিতে কথাগুলি লিখিলাম। আমার উপরে রাগ

করিয়া বসিও না। দেশের সবাই যদি বড় বড় লেখক হইয়া যায়, তবে দেশের জন্য কথা কহিবে কাহারা? লিখিয়া যশ ও অর্থ পাইলে কে যাইবে কথা কহিয়া পরমায়ুর অপব্যয় করিতে? আবার কথা কহিয়া যশ ও অর্থ পাইলে কে যাইবে কাজ করিয়া অবসরের সময় নষ্ট করিতে? সময় সময় লেখাটা একটা রোগের সামিল হয়। কখনো কখনো কথা কওয়া মানে বক্তৃতা দেওয়া আর একটা রোগ হয়। নীরবে নিষ্কাম চিত্তে সমাজের মঙ্গল-চিন্তা করাও এক প্রকারের রোগ কিন্তু এই রোগ দেবতাদেরও বাঞ্ছনীয়।

চায়ের হাঁড়িটা ঘাড়ে লইয়া যখন গ্রামে গ্রামে ফেরী করিতে যাও, তখন মানুষের সঙ্গে যতগুলি কথা বল, সব যাহাতে জনহিত-প্রবোধনের সহায়ক হয়, মাত্র একটা মাস তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চল দেখি! দেখিবে, তুমি নূতন জীবন পাইয়াছ। দুধের হাঁড়িটা যখন গরম কর, তখন মনে মনে অবিরাম দেশবাসীর ও জগদ্বাসীর মঙ্গল চিন্তা করিয়া যাও দেখি! একমাস পরে দেখিবে যে তুমি নূতন মানুষ হইয়াছ। লেখক রূপে পত্রিকার পৃষ্ঠায় তোমার নাম বারংবার ছাপা হইল না বলিয়া অন্তরে বৃথা-দুঃখ পোষণের দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৭ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০

(২ আগষ্ট, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও

যে নিদারুণ অন্নাভাবের সহিত তোমরা সংগ্রাম করিয়া আধমরার মত বাঁচিয়া আছ, তাহার বিষয় ভাবিয়া আমাদেরও হৃৎকম্প হইতেছে। এভাবে একটা জাতি দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না। একটা অঘটন কিছু ঘটিয়া গিয়া পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন না হইলে আস্তে আস্তে সমগ্র জাতির জীবনী-শক্তি নিস্তেজ হইয়া যাইবে এবং অপুষ্টিজনিত মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্করতর এক দারুণ রোগ সমগ্র জাতিকে আক্রমণ করিয়া তিলে তিলে মারিবে। এত আশার বাণী, এত আশ্বাস-বচন, এত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ক্ষমতাধিকারীরা কিছু করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না। দুষ্ট দুর্ব্বৃত্তেরা দৌরাত্ম্য করিলে মানুষ তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধ-পরিকর হয়। স্বজাতীয় হিতৈষীরা সর্ব্বনাশ করিলে গৃহদাহ ছাড়া মুক্তির অন্যতর পথ আছে কিনা, তাহা ভাবিতে হইতেছে। সমগ্র জাতি উৎকণ্ঠিত কিন্তু নীরোর মতন ক্ষমতাধর পুরুষ বা নারীদের ভোগৈশ্বর্য্যের অপচয় কমিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আমরা দুর্ব্বৃত্ত-দমনের প্রচলিত পথে পদক্ষেপ না করিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস লইয়া ক্ষুধার্ত্ত জঠর বাম হাতে চাপিয়া রাখিয়াই ডান হাতে যতটুকু পারি, পূর্ব্বনির্দ্ধারণ-মত কাজ করিয়া যাইব। দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, দুর্দ্দৈবের মধ্য দিয়াও আমরা "জয় পরমেশ্বর" ধ্বনি দিয়া নিজেদের চির-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া যাইব। চারিদিকে ক্ষুধার্ত্তের ক্রন্দন,—এই ক্রন্দন সুদূর কালে হইলেও আমরা থামাইব।

অনেকেই তোমরা এক বেলাও অধিক খাইতে পাইতেছ না, বিশেষ করিয়া তোমরা মহিলা, এই অবস্থাতেও তোমরা এই বর্ষার বৃষ্টি-বাদল মাথায় লইয়া পদব্রজে বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে গিয়া আদর্শের বাণী প্রচার করিয়া করিয়া ঘরে ফিরিতেছ, তোমাদের এই

নিষ্ঠা, এই সঙ্ঘবদ্ধতা, এই সৎসাহস ও এই শ্রমক্ষমতা দেখিয়া মা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। যাহাদের বল আছে, ধন আছে, বিদ্যা আছে, প্রতিপত্তি আছে, সেই লোকগুলি যদি তোমাদের এই সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, তবে কত ভাল হইত। প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষেরা বা প্রভাবশালিনী মহিলারা ভিন্ন গ্রামে গিয়া দুইটা কথা বলিলে যে কাজটুকু হয়, অপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ পুরুষ-নারীরা গিয়া দশটী কথা বলিলেও সেই কাজ হয় না। কিন্তু উহাদের ধন আছে বলিয়া অবসর কম; উহাদের বিদ্যা আছে বলিয়া আত্মসম্মান-জ্ঞান অত্যধিক, উহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলিয়া অহমিকার সীমা নাই, তাই তাহারা সৎকাজে সময় নষ্ট করিবে না। কিন্তু মা, তোমরা যাইতেছ প্রাণের সরস দরদ লইয়া, চিত্তভরা প্রেম লইয়া, অফুরন্ত বিশ্বাস লইয়া, সুনিশ্চিত সৎসঙ্কল্প লইয়া। তোমাদের বিদ্যা নাই, ধন নাই, সামাজিক প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া মনে দ্বিধা, সংকোচ, সংশয় বা ভয় রাখিও না। আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাইতে থাক। ধারাবাহিক যাতায়াতের ফলে তোমরা মরুভূমিতে শ্যামল উদ্যান সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে। সেই আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের প্রতিজনকে করিয়া রাখিতেছি। আজ যে কাজটুকু করিয়া রাখিতেছ, তাহার ফল হাতে হাতে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না, তাহার ফল তোমরা তিন শতাব্দী পরে হইলেও পাইবে। আমার আশ্বাসনে বিশ্বাস করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

বারাণসী

হরিওঁ

১৭ শ্রাবণ, ১৩৬০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নূতন এই জীবনে দৃঢ়পদে ধর্ম্মপথে চলিতে সমর্থ হও এবং ধর্ম্মাচরণ-জনিত সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের তোমরা উভয়ে অধিকারী হও।

বিবাহিত জীবনে কি ভাবে চলিলে জীবন আদর্শ-ভ্রষ্ট হইবে না, তদ্বিষয়ে আমি সহস্র সহস্র পত্র নানা জনকে লিখিয়াছি। তন্মধ্যে কিছু পত্র "সধবার সংযম" নামে প্রকাশিতও হইয়াছে। এই বহিখানা কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়া বারংবার পাঠ করিও।

এই কথাটী মনে রাখিও যে, সদাচরণ, ধর্ম্মাচরণ, লোকহিত-সাধন আত্মোন্নতিকর যাহা-কিছু কাজই কর, স্বামীটীকে সর্ব্বদা সঙ্গী করিয়া লইতে চেষ্টা পাইবে। বিবাহিত হওয়ার মানেই হইতেছে জীবনের যাত্রা-পথের একজন নিত্যসাথী পাওয়া। তোমার অন্তরে যে সকল সদ্‌ভাব ও সদ্‌ভাবনা আছে, তাহাকে তাহার ভাগী করিয়া লইতে চেষ্টা পাইও। তাহার ভিতরে যাহা মহনীয় এবং বরণীয় আছে, তাহা তোমার নিজের চিন্তাজগতের পরিধির মধ্যে আনিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। স্বামী ও স্ত্রীতে স্থায়ী মনোমিলনের ইহা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

যে কাল ছিল কুমারী বা অনাঘ্রাত পুষ্প, সে আজ বিবাহিতা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই হঠাৎ একটা বাসী ফুলে পরিণত হইয়া না যায়, এজন্য তাহাকেই নিজের আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাহার স্বামীর

রুচি, প্রকৃতি ও অভ্যাসের উপরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং দুজনেরই পক্ষে প্রীতিকর জীবন-যাত্রার কর্ম্মসূচী তৈরী করিয়া নিয়া একে অপরকে আত্মোৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে দূর হইতে বা বাহির হইতে কেহ আসিয়া কোনও বুদ্ধি বা পরামর্শ যোগাইতে পারে না মা। কুমারী-জীবনেই অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া মনুষ্য-জনমের সার্থকতার বিষয়ে কিছু পথনির্দ্দেশ আপনা আপনিই পাইয়াছ। তাহারই আলোকে পথ চলিতে সুরু কর। চলিতে চলিতে দেখিবে যে তোমার গৃহীত পথই তোমাকে পরবর্ত্তী আচরণের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইতেছে।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে নিজ পিতামাতার তুল্য পূজনীয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবাসাধনার্থে এবং সুখবিধানের জন্য সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে ব্রতী থাকিও। ইহার দ্বারা তুমি তাঁহাদের বিবল স্নেহের অধিকারিণী হইবে। দীক্ষিতা কুমারীরা অনেক সময়ে বিবাহের পরে স্বামীর ঘরে গিয়া দেখে যে শ্বশুর-শাশুড়ীরা অন্য মন্ত্রে এবং অন্য তন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া পূর্ব্বদীক্ষিতা বধূর উপরে ধর্ম্মান্ধতা-হেতু আক্রোশে ফাটিয়া পড়ে এবং ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ওছিলা ধরিয়া তাহার উপরে নির্য্যাতন করে। ইহা তাহাদের মূঢ়তা বা অন্ধতার ফল। কিন্তু উৎপীড়নটা ত সত্য সত্যই ক্লেশকর। উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়ার অনেক সদুপায় আছে, যাহা কালক্রমে আবিষ্কৃত হয় কিন্তু একটা মস্ত সদুপায় হইতেছে শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি লইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার চেষ্টা করা।

তোমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে আমার কোনও ভক্ত বা অনুরক্ত ব্যক্তি আছেন কিনা, আমার জানা নাই। কেহ এরূপ থাকিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে অখণ্ড-মণ্ডলী গঠিত হইবে এবং সমবেত উপাসনার

সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানও সুরু হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি নবীন কুলবধূ, তোমার পক্ষে স্বামিগৃহের গুরুজনদের আদেশ ও অনুমতি না লইয়া ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিবার চেষ্টা সঙ্গত হইবে না। বিবাহ করিলেই মেয়েদের স্বাধীনতা প্রায় চৌদ্দ আনা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু স্বামী যদি সহায় থাকে, তাহাকে যদি তোমার ধর্ম্মমতের সমর্থকে পরিণত করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তুমি অনায়াসে যে-কোনও স্থানে যে-কোন ধর্ম্মকার্য্যে যোগদানের জন্য যাইতে পার। মোট কথা, রগ বুঝিয়া চলিও, জিদের বশে চলিও না। • • • ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

বারাণসী

১৭ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাকে কখনো দেখ নাই আর থাক কত দূর দেশে, সেই দরং জেলায়, অথচ আমার লেখা পড়িতে ভালবাস। ইহা ত আহ্লাদের কথা। আমি যে সকল কথা লিখি, যে সকল চিন্তা-ভাবনা করি, তাহার সহিত পরিচিত হইলে মানুষের ইতর রুচি, দুরন্ত স্বার্থস্পৃহা, খলতা, কপটতা কমিয়া যাইবে, তোমার এই মন্তব্যের সহিত ভিন্নমত হইবার

কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু ভিন্ন রুচির, ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন স্বার্থের লোকেরা ইহার বিপরীত কথায় বা চিন্তায় আনন্দ পাইবে, এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইতে তোমার কষ্ট কেন? আমার কথাগুলি লোককে শুনাইতে গিয়া তুমি লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইয়াছ জানিয়া সত্যই ব্যথিত হইলাম। তবে, জগতে এই রীতিও প্রচলিত আছে যে, যাহারা ভাল কথা বলিতে বা ভাল কথা শুনাইতে যায়, তাহাদিগকে মন্দ আখ্যা দিয়া হতমান করার চেষ্টা করাও কেহ কেহ সঙ্গত মনে করে। তুমি ত তুমি আর আমি ত আমি, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের মতন পবিত্র পুরুষকে ভাল কথা বলিবার দোষে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এক শ্রেণীর লোক জগতে চিরকালই হয়ত থাকিবে, যাহারা ভাল কথার, ভাল কাজের দাম দিবে অত্যাচার দিয়া, উৎপীড়ন দিয়া, অসম্মান দিয়া। ইহাদের ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। ইহাদের প্রতি তোমার যেন কখনো কোনো বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব না জাগে, এই বিষয়ে তুমি সতর্ক থাকিও।

কেহ কেহ আছে, ভাল কথাকে মন্দ অর্থে ব্যবহার করে। তুমি বলিলে,—"ভাই হে, রাস্তাটা বড় খারাপ, একটু সতর্ক হইয়া চলিও।" সে জবাবে বলিয়া বসিল,—"আমাকে তুই কাণা বলিলি, নয় অন্ধ ভাবিলি কোন্ অধিকারে।" তুমি বলিলে,—"এ জিনিষটা বেশী খাইবেন না, জিনিষটা গুরুপাক, পেট ফাঁপিতে পারে।" জবাবে শুনিতে হইল,—"আমাকে লোভী বলিয়া গালি দিলে তুমি কোন্ অধিকারে?"

এরূপ ক্ষেত্রে সৎকথা বা সদুপদেশ দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া চলাই ভাল। তবে, কেহ যখন উপদেশ-প্রার্থী হইবে, তখন তাহার সম্পর্কে কৃপণ হইলে চলিবে না।

অপরে কি কি দোষের অনুশীলন করিতেছে, তাহা নিয়া মাথা ঘামাইও না। কাহার পরিবার-বর্গের মধ্যে গোপন পাপের উৎকট অভিযান চলিয়াছে, ওৎ পাতিয়া তোমার তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি? পৃথিবীর সব লোককে ত আর তুমি সংশোধিত করিতে পারিবে না! তুমি পারিবে কেবল সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকেই সংশোধিত করিতে। এই খাঁটি এবং সরল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিও। তাহা হইলেই জীবন-পথের অধিকাংশ জটিলতা দূর হইয়া যাইবে। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১৭ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা—, প্রত্যেকে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। একজনের পত্র দশ জনে পড়িও। প্রত্যেকটি কথা প্রায় প্রত্যেকেরই জন্য জানিও।

তোমরা পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনা এবং নিজেদের জীবনের সদাচরণ দ্বারা পরিবেশকে গ্লানিমুক্ত কর। দেখিবে, কম কথায় কত বেশী কাজ হয়। নিজেরা সৎ, সাধু, নীতিমান্ ও ন্যায়নিষ্ঠ না হইলে অন্যকে সৎপথে বা সংশোধনের দিকে টানিয়া আনা যায় না। নিজেরা সততা-সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্ হও। তাহার ফলে আস্তে আস্তে চারিদিকের পরিবেশ অনুকূল হইয়া যাইতে থাকিবে। দুর্য্যোগের দিনে অগ্রগমন দ্রুত হয় না, সুতরাং অগ্রগতি কম হইতেছে বলিয়া অনুতপ্ত হইও না, গতিহীন স্থবির হইয়া যাহাতে না যাও, তাহা দেখ।

আমি যে পতাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি, কোনও ঝঞ্ঝা, কোনও ভূকম্প, কোনও প্রলয় সেই পতাকার ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমরা আমার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাজে লাগো। বিশ্বাস এক মহাবল। ইহা যাহার আছে, সে কদাচ নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিভ্রষ্ট হয় না, হইতে পারে না। প্রাণভরা বিশ্বাস লইয়া কাজ কর। মানুষের সহিত কপটতা করিও না।

যাহারা কাজ করিবে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যও পালন কর। ব্রহ্মচর্য্য তোমাদের কাজকে দিবে শুচিতা, ঋজুতা, সাবলীলতা। ব্রহ্মচর্য্য যে প্রকৃত মানুষের কত বড় শ্লাঘা, কত বড় সম্বল, কত বড় সহায় এবং কত বড় সম্পদ, তাহা ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে টের পাইবে। ব্রহ্মচর্য্যকে বিজ্ঞাপনের বিষয় না করিয়া অনুশীলনের বস্তু কর। যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, ভিতরে ও বাহিরে তাহার ততটুকু বল বাড়িবে। শুধু বলই বাড়িবে, তাহা নহে, ধৈর্য্য বাড়িবে, সহিষ্ণুতা বাড়িবে, ক্ষমাশীলতা বাড়িবে, সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনের যোগ্যতা বাড়িবে। এ কথায় অত্যুক্তি নাই।

মহৎ কিছু করিতে হইলে দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনুকূল শুচিতা সৃষ্টি করার কাজে লাগিতে হয়। পরিবেশ পরিশুদ্ধ না হইলে সৎকাজ সহজে সফলতা আহরণ করে না। ছয় মাস বা এক বৎসর পরে যে সুমহৎ অনুষ্ঠানটী করিতে চাহ, তাহার সাফল্য-সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনে তোমাকে আজই বায়ু-পরিমণ্ডল পরিশোধনের কাজে লাগিতে হইবে। আমরা যে ঘরে ঘরে যাইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও উপাসনা করিতে বলিতেছি, তাহা শুধু এই কথাটুকু ভাবিয়া। রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্লোগান, জনসমাবেশ, বক্তৃতাদান, পথ-সভা

বা প্রদর্শনী প্রভৃতি যতটা আবশ্যকীয়, আমাদের সাত্ত্বিক কাজগুলিতে পাঠ, কীর্ত্তন ও উপাসনা তার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন ও আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, আমার দেহাবসানের পর অখণ্ডেরা গড্ডলিকা-প্রবাহেই ভাসিয়া বেড়াইবে, নিজস্ব কোনও আদর্শে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

প্রশ্নকর্ত্তা অধিকাংশ অখণ্ডের প্রকৃতি ও রুচির দিকে তাকাইয়াই এই প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

আমি জবাব দেই নাই। কেননা, যে জবাব কাল-প্রতীক্ষা করিলে আপনা আপনিই পাওয়া যাইবে, তাড়াহুড়া করিয়া নিজ মুখে তাহা ব্যক্ত করিবার মধ্যে বিশেষ সার্থকতা কি আছে?

আমি মনে করি যে, আত্মশুদ্ধি দ্বারা পরিবেশকে শুচি ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার মধ্যেই তোমাদের যাবতীয় সফলতার খনি লুক্কায়িত রহিয়াছে। খনি মাটির অনেক নীচেই সাধারণতঃ থাকে। সুতরাং মাটির উপরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহা অধিকাংশ সময়েই পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব নহে। নিজে প্রতিনিয়ত নিজ চিত্তবৃত্তিকে শুচিতা ও সংযমের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা কর এবং অপরাপরের অন্তরেও সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার কাজে সহায়তা কর।

সর্ব্বসময়ে মনে রাখিও যে, কথা কাজের জন্য, কাজ কথার জন্য নহে। কথাকে অতি-প্রাধান্য প্রদান করিলে কাজ পথের ধূলায় পড়িয়া কেবল কাঁদিতে থাকিবে। কাজের জন্যই কথা। সুতরাং অল্প কথার পরে অধিক কাজই প্রত্যাশার যোগ্য হইবে। যেখানে দেখিবে কেবল কথা আর কথা, সেখানে কাজ হইবে কি করিয়া? সমস্ত সামর্থ্য ত' ফুসফুসের ব্যায়াম করিতেই ফুরাইয়া যাইতেছে! প্রত্যেকে কথা কমাও।

হয়। ক্রমে প্রাণে প্রেম আসিলে। প্রেম প্রত্যেকের অন্তরেই স্বভাব-সম্পদ রূপে রহিয়াছে। তাহাকে কোথায় চালিতে হইবে, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর। নামযশোলোভের কবলে প্রেমকে ফাঁদে আটক পড়িতে দিও না। প্রেম তোমার নিষ্কাম হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুনকী
২৩শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮০
(৮ আগষ্ট, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যে-কোনও একটা সৎ উপলক্ষ্যে সকলে মিলিত হইবার সুযোগ নেওয়া এবং এই মিলনের ফলে দেশ, সমাজ, জাতি বা জগতের কোনও না কোনও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সেবা করা একটা আনন্দজনক, লাভজনক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-বিধায়ক ব্যাপার।

অনেক লোক যদি একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলে, তবে তাহাতেও নিবিড় ঐক্য অনুশীলিত হয়। এক রকমে চলা, এক রকমে বলা, এক স্থানে সকলের শ্রদ্ধার দান অর্ঘ্য-স্বরূপে রাখা, এক সময়ে খাওয়া, এক সময়ে নাওয়া, এক সময়ে খেলা, এক সময়ে উপাসনা ইত্যাদি দ্বারাও অসাধারণ ঐক্য সাধিত হইয়া থাকে।

৭

একই উদ্দেশ্যে নানা জনে আর্থিক ত্যাগ-স্বীকার করিতেছে কিন্তু তথাপি ত্যাগের কেন্দ্রটা তোমাদের এক হইতেছে না। যে যেখানে ইচ্ছা, দানের অর্ঘ্য ঢালিয়া বা ছুঁড়িয়া দিতেছ। কেহ বুঝিতেছ না যে, স্থান সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে সকলের পুষ্পাঞ্জলি সেই একটী স্থানে পড়িলে, অন্য কিছু অতিরিক্ত লাভ যদি নাও ওঠে, তবু দেখিতেও ত হয় অপরূপ মনোরম, প্রাণ-মাতোয়ারা। সকলে মিলিয়া সেই দৃশ্যটা দেখিবার যদি আগ্রহ না জন্মে, তবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সমবেত উপাসনা সকলের মিলিবার সুযোগ দানের জন্য। একই তারিখে অকারণে এক সঙ্গে তিন চারি পাঁচটী স্থানের উদ্যোক্তারা তিন চারি পাঁচটী সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করিল। মিলনের শুভফল ইহাতে পাইবে কি? অন্যগুলি একটু আগে সারিয়া লইলেও সকলে সুনির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে আসিয়া ঐক্যবদ্ধ সংযোগ সাধন করিল, ইহার ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব? অসম্ভব নহে, কিন্তু তোমাদের জাতীয় চরিত্র অত্যন্ত বিভেদকামী। মিলিবার সুযোগ যে মহাত্মাই যখন আসিয়া করিয়া দিয়াছেন, তখনই অবসর পাওয়া মাত্র তোমরা কেবল দলের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য বাড়াইয়াছ। শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ প্রভৃতি তোমাদের পরীক্ষার হলে খাতা লিখিতে বসিয়া একে একে ফেল মারিয়া বসিলেন। একমাত্র গুরুনানকই এখনো ফেল-মার্কাটী পান নাই এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার অনুচরগণ নানক-বাণীকে গুরু-গোবিন্দের সংশোধনীর মধ্য দিয়া মহম্মদীয় শৃঙ্খলায় পালন করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, অতি-বৈচিত্র্য-জাত ব্যক্তিত্বের বিলাস পরিহার না করিলে আস্তে আস্তে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

এক সাথে চল, এক সাথে বল,—সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং—বৈদিক ঋষিদের বাণী। সেই বাণীকে তোমরা প্রণাম কর, সম্মান কর, কিন্তু পালন কর না। শিখ বা মুসলমান গ্রন্থসাহেব বা কোরাণের বাণীকে সম্মানও যেমন করে, পালনও তেমন করে। আজানের আওয়াজটী শোনামাত্র মুসলমান দ্রুত ওজু সারিয়া প্রার্থনার স্থানে ছুটিয়া আসে। আর তোমাদের?

সর্ব্বত্র সমবেত উপাসনার পাঠ ঠিক ঘাড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ করিবে। কে হোমরা-চোমড়া লোক আসিতে দেরী করিয়াছেন, এজন্য উপাসনা আরম্ভ করিতে দেরী করিতে পার না। তবে, কোনও হোমরা-চোমরার প্রতি আক্রোশবশতঃ তোমরা আবার অতিরিক্ত সময়-নিষ্ঠা দেখাইতেও যাইও না। উপাসনা মনকে প্রসন্ন করিবার জন্য, বিদ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা বা বৈর-নির্য্যাতনের উদ্দেশ্য বা মানসিকতা নিয়া উপাসনা সুরু করিতে পার না।

কেবল ভাবিতেছি, কবে তোমরা এক সাথে চলিতে, এক সাথে বলিতে, এক রকমে ভাবিতে, এক রকমে কর্ম্ম করিতে, এক রকমে বাঁচিতে এবং এক রকমে জীবন দান করিতে শিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আশ্রমের জন্য একজন কেহ ভূমিদান করিবেন শুনিয়া তুমি উল্লসিত হইয়াছ। আমি বিপদ গণিতেছি। প্রথম বিবেচ্য হইতেছে এই যে, ঐখানে একটা আশ্রম গড়িবার আবশ্যকতা আছে কিনা। দ্বিতীয় বিবেচ্য এই যে, যিনি ভূমি দান করিতে আসিয়াছেন, তিনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ঐ ভূমির সত্ত্বাধিকারী কিনা। তৃতীয় বিবেচ্য, তিনি ভূমিদান করিবার পরে বারংবার আশ্রমের আভ্যন্তরীণ কাজে কথে হস্তক্ষেপ করিয়া কর্ম্মীদের কাজ করিবার উৎসাহ, উদ্যম, রুচি ও প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিবেন কিনা। কিন্তু সবগুলি বিবেচনার চেয়েও বড় বিবেচ্য এই যে, লোকের কাছে ভিক্ষা না নিয়া, চাঁদা না তুলিয়া আশ্রমটী নিজের খরচ নিজে চালাইতে পারিবে কিনা।

আরও সমস্যা আছে। সেইটী হইতেছে কর্ম্মীর। গণ্ডার পর গণ্ডায় বা কুড়ির পর কুড়িতে আশ্রমের সংখ্যা যেমন বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতযুক্ত-সংখ্যক কর্ম্মীও ত বাড়া প্রয়োজন। আশ্রম স্বোপার্জ্জনে নির্ভরশীল হইয়া গেলে অতি সাধারণ দক্ষতা-সম্পন্ন কর্ম্মীর উপরেও ভরসা করা যায়। আশ্রম স্বোপার্জ্জনশীল না হইলে সুদক্ষ কর্ম্মীকেও নাজেহাল হইতে হয়। এতগুলি কথা ভাবিবার আছে।

শাখা আশ্রম স্থাপন করিবার পরে মূল আশ্রমকে যে সকল দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়, তাহা হইতেছে, শাখা-আশ্রমের কর্ম্মীর অনবধানতা বশতঃ অর্থের অপচয়, অসততা বশতঃ অর্থের অপহরণ, আনুগত্যহীনতার দরুণ নানা আইন-কানুন-ঘটিত জটিলতা, স্থানীয় লোকের সহিত সৌহৃদ্যের অভাব হেতু শাখার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মূলকেন্দ্রের পক্ষে স্থানীয় লোকদের নিকটে হেয় হওয়া, শাখা-কর্ম্মীর ঔদ্ধত্য, দুর্ব্বিনয়, কলহপ্রিয়তা হেতু স্থানীয় লোকের সহিত নিত্য বিরোধ এবং অনেক সময়ে

প্রতিষ্ঠানের ভূমি-সীমা লইয়া চারিদিকের প্রতিবেশীদের সহিত কলহ। এই কলহ কখনো কখনো মামলা, মোকদ্দমা, মারামারি, মাথাফাটা-মূলক নানা অপকার্য্যের পর্য্যায় পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে।

দাতার অল্পমূল্যের জমি দান-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তার উপরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিবার পরে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, দাতার অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রায় সব সাবালকেরাই একবার করিয়া সিং বাঁকাইয়া প্রতিষ্ঠানটিকে ঢু মারিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি না, কিন্তু এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভূমিটুকুর উপরে ভূমির উন্নতিসাধনের জন্য তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিতেই হইবে, যাহাতে প্রয়োজনীয় বাড়ীঘর তৈরী করিতে তোমার এক লাখ টাকা অবশ্যই লাগিবে, সেই দুই হাজার টাকা মূল্যের জমিটুকু তুমি দানে পাইতেছ বলিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইও না। বরং দুই হাজার টাকার জমিই তুমি কয়েক দিন কষ্ট স্বীকার করিয়া চেষ্টা-যত্ন করিয়া পাঁচ হাজার টাকায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কিনিয়া লও। তারপরে মনের সুখে তাহার উপরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিও। নতুবা অশান্তি, অসম্মান ও অনুচিত অপবাদ তোমাকে সহিতে হইবেই হইবে। আমি এই বিষয়ে এক নির্ব্বোধ ভুক্তভোগী বলিয়া আমার জীবনের কুড়ি বৎসর বৃথা-শ্রমে অপচয়িত হইয়া গিয়াছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে সে বল নাই, যে বল লইয়া তখন কাজ করিতাম। অথচ তোমরা আমার প্রত্যক্ষ সেবাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছ।

কেহ আশ্রম স্থাপনের জন্য কিছু ভূমি দান করিতেছে শুনিয়াই আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইও না। সুদীর্ঘকালের প্রয়াসে কোনও

স্থানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ট হইবার আগে সেখানে আশ্রম স্থাপনের কল্পনাও করা উচিত নহে। বরং প্রত্যেকটা মানুষকে এক একটা মূল্যবান্ ভূমি জ্ঞান করিয়া তাহাকে একটা জীবন্ত আশ্রমে, সচল আশ্রমে, মূর্ত্তিমান্ আশ্রমে পরিণত করিবার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। প্রেম সহকারে মানুষের মধ্যে কাজ করিতে করিতে দেখিবে, মানুষ-রূপী বহু জীবন্ত আশ্রম একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে ভূমিগত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন সম্পর্কে যত সংশয়, সন্দেহ, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা বা বিপদ থাকিতে পারে, সবই আপনা আপনি মিটিয়া যাইতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর পুপুন্কী
২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি বর্দ্ধমান আজই যাইতেছি। কিন্তু বর্দ্ধমান কবে যাইব বা না যাইব, তাহার উপরে তোমার ভ্রমণ-তালিকা নির্ভর করিবে কেন? যখন যেখানে যাইব, আচম্বিতেই যাইব। এখন এত অফুরন্ত অবসর নাই যে, তিন মাস আগে হইতেই ব্যাপক ভ্রমণ-তালিকা সকলকে জানাইয়া দিব। তোমরা যদি প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত না থাক, তবে আমার ভ্রমণ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে।

তারিখ জানার আগে কাহারও ঘুম ভাঙ্গে না, ইহা এক দারুণ ব্যাধি। এই ব্যাধি সমগ্র জাতির আলস্য-ঔদাস্য-অবসাদ রূপ মজ্জাগত ব্যাধির একটী উপসর্গ।

তোমাদের সম্মেলনের বিবরণ আমি ভিন্ন সূত্রে অবগত হইয়াছি। তাহাতে খুব খুশী হইবার মত খবর যেমন নাই, তেমন বিমর্ষ, হতাশ, হতোদ্যম বা নিরুৎসাহ হইবার মতও কিছু নাই। আগে আগে ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তোমাদের মিলান যাইত না, এখন অল্প আয়াসে মাঝে মাঝে মিলিতেছ। মিলিতে মিলিতেই মিলন-শৈলী আয়ত্ত হইবে।

দুই একটী স্থান বা অঞ্চলের লোকেরা একেবারে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে বলিয়া মন খারাপ করিও না। বর্ষা-বাদল কমিয়া গেলে পাঠ-কীর্ত্তনের অভিযান নিয়া ঐ ঐ স্থানে মাঝে মাঝে হানা দিয়া আসিও। পর পর তিনটী বার যদি কোনো গ্রামে বা শহরে সফলতার সহিত এই কাজটী করিতে পার, তাহা হইলে বাহিরের জন-সাধারণের মধ্য হইতে তোমাদের অনেক অকপট সমর্থকের আবির্ভাব ঘটিয়া যাইবে। তখন এমন একটী লোকমত বা পরিবেশের সৃষ্টি হইবে যে, তোমাদের ঘরকুণো, স্বার্থপর, উদাসীন ও ভক্তিহীন গুরুভাইবোনদের মধ্যেও আত্ম-প্রকাশের জন্য সাড়া পড়িয়া যাইবে বা কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে। আমার পরামর্শ-মত কাজ পূর্ণ বিশ্বাস নিয়া কয়েক বার করিয়া দেখ। স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, আমি এমন কথা কখনো কহি না, যাহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সমুজ্জ্বল নহে।

আজ সম্ভবতঃ সন্ধ্যার সময়ে বর্দ্ধমানের পথেই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু কথা কহিবার সময় পাইব না। এজন্য পত্র বিস্তারিত লিখিলাম। তোমার যে যে স্থানে ভ্রমণ-তালিকা করিয়া

ঘুরিয়া আসিবার কথা আছে, আমা-নিরপেক্ষ ভাবে তুমি সে সে স্থানে নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাও। আমার পতাকা ধারণ করিয়া যেখানে গিয়া দাঁড়াইবে, জয়মাল্যই তোমার প্রাপ্য, পরাজয় কদাচ নহে। কারণ, সমগ্র জীবন আমি সত্যেরই পূজারী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, খলতা, কপটতা, অসরলতা বা অনাচারের আশ্রয় লই নাই। কাজ করিতে নামিলেই স্পষ্ট অনুভব করিবে যে প্রত্যক্ষ ভাবে হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, আমার ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সাফল্য তোমাদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন হইতেই তোমাকে আমি গভীর স্নেহের বস্তু বলিয়া জানিয়াছি। স্বল্পকাল দেখিলেও, তোমার ভিতরে স্বভাবতঃ যে সকল সদ্‌গুণ এবং যে সকল বিকাশ-সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমি হিসাবে গণিয়া পাইয়াছি এবং আমার হিসাব অভ্রান্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়া যাইবার পরে ভাবিতেছি, কে সেই মহাশত্রু, যিনি তোমাকে সুরাপান শিখাইলেন ?

এ অভ্যাসটি তোমার ছাড়িতে হইবে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে, শতকরা বিশ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সুরাসক্ত বা অন্যরূপ কোনও নেশার অধীন বলিয়া সমীক্ষাকারেরা বলিয়াছেন। যাহারা ছাত্র নহে, অথচ সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সদস্য, তাহাদের মধ্যে সংখ্যার শতকরা হার কত, তাহা জানিবার চেষ্টার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই। বয়স্কেরা নির্লজ্জ ভাবে এই কুশিক্ষায় দক্ষ না হইলে কি করিয়া অপ্রাপ্তবয়স্কেরা এমন নিদারুণ ভাবে মদ্যপানাসক্ত হইতে পারে? প্রধানতঃ বয়স্কেরাই ত তরুণদিগকে এই সকল পাপের শিক্ষা দেয়।

তোমাকে সুরাপানাসক্তি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক মদ্যপায়ী দীর্ঘ দিনের পুরাতন অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং তুমি কেন পারিবে না, বল ত! পর-নারীগামী পরনারী ছাড়িয়াছে, ব্যভিচারিণী নারী জার-সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক অনেক রহিয়াছে। আমি কাহারও উপরে গায়ের জোর খাটাইতে যাই নাই, গালি-মন্দও করি নাই। স্নেহভরে শুধু কহিয়াছি,—"ছাড়িয়া দাও।" তাহারা তাহা ছাড়িয়াছে এবং ছাড়িয়া থাকিতেও পারিয়াছে। তুমি কেন পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই তুমি জয়ী হইবে।

দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখের নেশার চাইতে মনের নেশা বেশী শক্তিপর নহে। একটা মুখের কথায় হাজার লোকের ইন্দ্রিয়াসক্তি টুটিয়া গিয়াছে। যাহারা ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী, তাহারা নিমেষে ভাই-বোন হইয়া গিয়াছে। আর তুমি মদ্যপান ছাড়িতে পারিবে না?

আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা বর্ত্তমান সময়ে নব-কর্ম্মীদিগকে

মদ্যপান শিখাইতেছেন। কিন্তু এদেশে অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষের মতন নেতাও ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া নবকর্ম্মীরা গীতা, ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মচর্য্যের বই পড়িত, মদ্যপান গর্হিত বিবেচনা করিত। বর্ত্তমান নেতারা ভ্রান্ত পথে চলিতেছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের কুশিক্ষাগুলি গ্রহণ করিব, এমন কোনও মাথার দিব্যি থাকিতে পারে না। কোনও প্রকার দলগত অভিসন্ধি হইতে কথাগুলি বলিতেছি না, বলিতেছি অকপট স্বদেশহিতৈষণা হইতে। চিত্তরঞ্জন দাস বিখ্যাত সুরাপায়ী ছিলেন, কিন্তু স্বদেশের সেবায় প্রকাশ্যে জীবনোৎসর্গের মুহূর্ত্তে একটী নিমেষের মধ্যে চির জীবনের অভ্যস্ত কদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তবে দেশবন্ধু রূপে পূজা পাইয়াছিলেন। কত বোতল উদরস্থ করিয়া কোন্ কোন্ ব্যারিষ্টার চিৎপাত হইয়াছিলেন আর সকলের শেষেও চিত্তরঞ্জন বেহুঁস হন নাই, এই সব নিয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র নিয়ত গুঞ্জন উঠিত। কিন্তু ধন্য তাঁহার চরিত্রবল যে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নিবার পরক্ষণ হইতে আমৃত্যু আর মদ্য স্পর্শও করেন নাই। এসব দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া যাইবার মতন নহে।

তোমাদের এক গুরুভ্রাতা ডাক্তার কেদারেশ্বর মত্ত অবস্থায় আসিয়াছিল বলিয়া প্রথম দিন দীক্ষা তাহাকে দেই নাই। দ্বিতীয় দিন অতি কষ্টে মদ না খাইয়া দীক্ষামণ্ডপে ঢুকিল। তারপর হইতে সমস্ত জীবন সে মদ্যস্পর্শও করে নাই। মৃত্যু-সঙ্কট পীড়াকালে অন্য চিকিৎসক-বন্ধুরা শত অনুরোধ উপরোধ করিয়াও তাহাকে এক ড্রাম ভাইনাম গ্যালিশিয়া সেবন করাইতে পারে নাই। সে মরিল কিন্তু বীরের মতন নিজের আদর্শ বজায় রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এসব দৃষ্টান্ত উপেক্ষার নহে।

সেক্স্পীয়ার মদ খাইতেন, মাইকেল মধুসূদন মদ খাইতেন, লেনিন ভড্কা খাইতেন, এসব বলিয়া মদ্যপানের স্বপক্ষে যুক্তিদান নিতান্তই মূঢ়তা। অন্য দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশের শীততাপের অবস্থা বুঝিয়া বা সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী যাহা করিয়াছেন বা আমাদের দেশের প্রতিভাবান্ কোনো কোনো পুরুষ বা নারী কুসঙ্গে পড়িয়া যাহা শিখিয়াছেন, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, আমাদের অনুকরণীয় নহে।—তোমাকে মদ্যপান পরিহার করিতেই হইবে।

তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের নাম করিয়াও অনেকে সুরাপান করিয়া থাকেন। কিন্তু রামপ্রসাদ মদ খাইতেন বলিয়াই তোমার খাওয়াটাও বৈধ হইল বলিয়া কদাচ জ্ঞান করিও না। রামপ্রসাদ ভাল করিতেন বা মন্দ করিতেন, ইহা নিয়া আমাদের জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন নাই কিন্তু পারতপক্ষে আমরা পৃথিবীর একটী প্রাণীকেও মদ্যপ থাকিতে দিব না, এই চেষ্টা আমাদের থাকা উচিত। আমি ও সাধনা আমাদের বন-পাহাড়ের অভিযানগুলিতে যে যে স্থানে মদ্যপানাসক্তি কমাইতে পারিয়াছি, সেই সেই স্থানেই দেখিয়াছি যে, দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মানুষের দেহের শ্রী, গৃহের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি মালটিভারসিটি রেজিষ্টার্ড হইয়াছে। দলিলে কি রাখিয়াছি জানো? যাহারা মদ্যপান করে, এমন ব্যক্তি কদাচ ইহার সদস্য হইতে পারিবে না।

সম্প্রতি সরকারী চেষ্টায় কয়লার খনিগুলিতে মালকাটা মজুরদের বেতন অপ্রত্যাশিত রূপে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা এই শ্রমজীবীদের বাস্তব লাভ কিছু হইল কি? সব পয়সা ত মদের দোকানেই উজাড় হইয়া যাইতেছে। শ্রমিকদের বেতন আজ যাহা বাড়িয়াছে,

কাল যদি তাহার চতুর্গুণও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেও ইহাদের বাস্তব উপকার কিছুই হইবে না। কারণ, ইহাদের মদ্যপানাসক্তি কমাইবার চেষ্টা না সরকার, না গণনেতৃবৃন্দ, না ধর্ম্ম-শিক্ষকেরা—কেহই করেন নাই। সাত্ত্বিক ধর্ম্ম-প্রচারকদের এই শ্রমিকদের সংস্পর্শে যাইবার সুযোগ সুবিধা কম, কিন্তু গণনেতৃবৃন্দ এবং সরকার এই শ্রমজীবীদের অর্থেই পুষ্ট হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা মদ্যপান নিবারণের জন্য কোনও চেষ্টা ত দূরের কথা, চিন্তাও কেহ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে না।

তবে কি সুরাপান কেবল বাড়িয়াই চলিবে? বৈদিক ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন বলিয়া আমাদের দেশে সোমলতার রসের বদলে কেবল মদের মহোৎসবই চলিবে? চলিবে না। তোমরা এক জন এক জন করিয়া আস্তে আস্তে হাজার জন মদ্যপান ত্যাগ কর। ক্ষতির মধ্যে সরকারী আবগারী বিভাগের কিছু রাজস্ব কমিবে। আর কোনো ক্ষতি কাহারও হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (৪০)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

কল্যাণীয়াসু :— ২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কন্যা-বিবাহের পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রে তোমাদের ঠিকানা ছিল না। ভাবিতেছিলাম যে, উত্তর কি করিয়া দেই। দৈবাৎ

বারাণসী যাইবার পথে তোমার কন্যাকে দেখিতে পাইয়া কি যে আনন্দিত হইয়াছিলাম, বলিবার নহে। শান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দময় একটী চেহারা। আশীর্ব্বাদ করি, নবদম্পতীর জীবন সুখময় হউক।

স্বামী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধু, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ প্রতিটি আত্মীয়কে নিরন্তর শিক্ষা দাও যে, ভগবানে আত্মসমর্পণেই সুখ এবং সেই আত্মসমর্পণ সংসার-ধর্ম্ম পালনের মধ্য দিয়াই অধিকাংশ মানুষকে করিতে হইবে। পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক মানুষকেই যতি-ব্রত পালন করিয়া চলিতে হয়। অপর সকল মানুষই সংসার-ব্রতের মধ্য দিয়াই জীবনের চরম চরিতার্থতাটুকু অর্জ্জন করিবে। তাহা পারাও যায়। পারা যায় বলিয়াই সংসারী জীবনকে শুধু সংসারী বলা হয় না, বলা হয় সংসার-ধর্ম্ম বলিয়া।

প্রতিটি পিতামাতা যদি নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে কচি বয়স হইতেই এই কথাগুলি শুনাইতে থাকে এবং কর্ত্তব্য-পালনের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সহস্র প্রকারের জটিলতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যেও প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। এই চেষ্টাটুকু তোমরা কর না বলিয়াই ত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বিপথে বিভ্রান্তিতে ভুগিতেছে।

তোমার কন্যাকে দেখিলাম, বেশ হাসিখুশী। আশা করি, তোমার জামাতাটীও অনুরূপ হইয়াছে। তাহাদের দুই জনকেই ঈশ্বরানুরাগী করিবার চেষ্টা করিও। ঈশ্বরানুরাগ মানুষকে বিগতমোহ, বিগতরাগ, বিগতকল্মষ করে। ঈশ্বরানুরাগ মানুষের যাত্রাপথকে সুখপ্রদ ও গতি-বেগকে নিরাপদ করে। ঈশ্বরানুরাগ মানুষের মন ও মেজাজকে স্নিগ্ধ

ও সরস করে। তোমরা প্রত্যেকে পরমেশ্বর-প্রেমিক হও এবং তোমাদের স্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারা চারিদিকের সকল শুষ্কহৃদয়, শীর্ণপ্রাণ, দুর্বল ও দুঃস্থ জনগণকে প্রেমের হর্ষে সঞ্জীবিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অত্যন্ত পীড়িত শরীরে কলিকাতা, পুপুন্‌কী আর বারাণসীর মধ্যে ছুটাছুটিতে আছি। প্রত্যেকের প্রত্যেক পত্র পড়িবারই অবকাশ নাই, উত্তর দিব কখন? পত্র লিখিয়াই শান্ত হইয়া বসিও। তোমার নিজের মনের কাছে আমার জবাব পাইয়া যাইবে। এইটুকু যদি তোমাদের জীবনে সত্য না হইবে, তবে আমি গুরু হইলাম কি ব্যবসায় করিবার জন্য?

পরিবেশ অশান্তিপূর্ণ বিধায় শহরের অপর অংশে বাড়ী কিনিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নবগৃহ-প্রবেশ মঙ্গলপ্রদ হউক।

দূরে বা কাছে গুরুভাই পাইলে কেবল তাকে সমাদরই করিবে না, সাধন করিতে, সৎপথ আশ্রয় করিয়া চলিতে, সমবেত উপাসনায়

যোগদান করিতে উৎসাহ দিবে। এটী তোমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য জানিও। প্রতি জনে এইরূপ ভাবে কাজ করিতে থাকিলে তোমাদের সংখ্যাবল একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হইবে। নতুবা দলে দলে শিষ্য-বর্দ্ধনের দ্বারা আমি আতঙ্ক বোধ করিতেছি।

নিশ্চয়ই আমি আমার পত্রে, পুস্তকে, বাক্যে, বক্তৃতায়, জীবনের আচরণে তোমাদের প্রতি জনকে কিছু না কিছু নূতন জিনিষ দিয়াছি বা দিতেছি, তোমার এই অনুমান মিথ্যা নহে। কিন্তু এই নূতনত্বের জন্য একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ধন্যবাদ দিবার উপায় নাই। কারণ যাহা অনন্তকাল ধরিয়া পুরাতন, তাহার মধ্যেও প্রকৃত নূতনত্ব, শাশ্বত নূতনত্ব, অবিসম্বাদী নূতনত্ব তিনিই দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা আমার দিকে বিস্ময়পুলকান্বিত দৃষ্টিতে না তাকাইয়া তাঁহার দিকে অধিকতর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, বিস্ময়, হর্ষ ও আনন্দ সহকারে দৃষ্টিপাত কর।

যে কথাটা একবার পড়িয়া এত হর্ষ অনুভব করিতেছ, সেই কথাটা বারংবার পাঠ কর। শতবার সহস্রবার পাঠ করিতে করিতে তাহার স্বরূপ অবগত হও এবং নির্য্যাস নিষ্কাশিত কর। তখন দেখিবে, নূতন জিনিষটী নূতনের চেয়েও নূতনতর, অথচ এই সত্য অনাদি অতীতে সত্যদর্শী ঋষি-মহর্ষিদেরও উপলব্ধিতে ধরা পড়িয়াছিল। * * *
ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
৩২ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৮০
(১৭ আগষ্ট, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লোকমুখে তোমার সম্পর্কে এমন কয়েকটা কথা শুনিলাম, যাহাতে প্রাণে মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করিতেছি। তুমি ত ভাল ছেলে। তোমার আচরণ মন্দ ছেলের মত কেন হইবে? তোমার এখন লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনের প্রশংসনীয় ও আদরণীয় করিতে পার। প্রশংসার যোগ্য আচরণ করিলেই প্রশংসার প্রত্যাশা করা যায়। আদরের যোগ্য আচরণ করিলেই আদরের আশা করা সঙ্গত। অসুন্দর অশোভন আচরণ করিলে অপরের প্রশংসা বা আদর পাওয়া যায় না। প্রত্যাশা করাও অন্যায়। একথা ত নিশ্চয়ই তুমি বোঝ।

যৌবনের স্বভাব উচ্ছৃঙ্খলতা। যৌবনের স্বভাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাল জিনিষ, উচ্ছৃঙ্খলতা মন্দ জিনিষ। যৌবন-কালে এই দুইটী জিনিষের যুগপৎ সহাবস্থান ঘটে বলিয়া দুশ্চিন্তা করিবার কারণ হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি উচ্ছৃঙ্খলতার অধীন হইয়া পড়ে, তবে সর্ব্বনাশ ঘটে। উচ্ছৃঙ্খলতা যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধীন হয়, তবে শত পতনের কারণ সত্ত্বেও কাহারও পতন ঘটে না, তাহার উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক এবং উন্নতির দ্বার অবারিত হইয়া যায়।

একটা কথা বলিয়া রাখি বাবা, জীবনে যদি সুখ, শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি আস্বাদন করিতে চাহ, তাহা হইলে পিতামাতার মনে গুরুতর ব্যথা কখনো দিও না। তোমার মাতা স্বর্গারোহণ করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা জীবনে যাহা কিছু অর্জ্জন বা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা কি একমাত্র পুত্র তোমারই জন্য নহে? তাঁহাকে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে, গুরুতর রুগ্নাবস্থায় এমন কোনও ব্যবহার দ্বারা ক্ষুব্ধ করিও না, যাহা তাঁহার প্রাণে গুরুতর ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে। পিতামাতার প্রতি যে অকৃতজ্ঞ, জীবনে সে খুব কম ক্ষেত্রেই সুখী হইতে সমর্থ হয়। তোমার অন্তরে একটী সুপ্ত বিবেক আছে, তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিও যে, তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি। উচ্ছৃঙ্খল যুবক-বন্ধুদের প্ররোচনায় পড়িয়া এমন কিছু করিও না, এমন কিছু বলিও না, এমন কিছু ভাবিও না, যাহা তোমার পিতার ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে আঘাত, আশাভঙ্গ বা বেদনা সৃষ্টি করিতে পারে। জীবনে সুখী হইতেই যদি চাহ, তবে জানিও, সুখ পিতৃমাতৃসেবার পথেই রহিয়াছে, উচ্ছৃঙ্খল ঔদ্ধত্যের পথে নহে।

আমার পত্র পাইয়া রাগ করিও না, চিন্তা করিতে বসিও যে আমি স্নেহই হিতবাক্য বলিয়াছি কিনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি

৩১ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

৮

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিলাম। তুমি তোমার যাবতীয় দুঃখ ও যাতনার জন্য, যাবতীয় দুর্দ্দশা ও দুর্গতির জন্য তোমার পিতামাতাকে দায়ী করিয়াছ। ভুল করিয়াছ। তাঁহাদের দয়া না থাকিলে অন্য কোনও নিকৃষ্টতর যোনিতে অপকৃষ্টতর দেহ ও মন লইয়া হয়ত তোমাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হইত। যতই দোষদর্শন কর, তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সদ্‌গুণও রহিয়াছে, যেগুলি বিনা চেষ্টায় তোমার ভিতরে আসিয়াছে এবং চর্চ্চা করিয়া যেগুলির বিপুল বিকাশ সাধন করিতে তুমি অবশ্যই পারিবে। এই যে আনুকূল্য, তাহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত দান না হইলেও, তোমার পক্ষে তাহারই জন্য কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, যে কোনো প্রকারের হউক, এক জোড়া মানুষেরই সন্তান হইয়া ভূতলে নামিয়াছ, বন-মানুষের বা বানরের সন্তান হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বর্ত্তমান মানবোচিত অসংখ্য সদ্‌গুণে অন্বিত হইবার জন্য তোমাকে দশ, বিশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ বৎসরের ক্রম-বিবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় দিন গুণিতে হইত।

পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যখন ভগবদ্দর্শনের জন্য পাগল হয়, তখন তাহা আমার কাছে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া মনে হয়। চখের সাম্‌নে করুণার অবতার-স্বরূপিনী মাতা ও স্নেহ-দয়ার আধার-স্বরূপ পিতাকে দেখিয়া যাহার ভক্তি হয় না, সে না-দেখা না-জানা এক ভগবান্‌কে দেখিয়া ফেলিবে এবং আনন্দপুলকিত কলেবরে গদ্‌গদ ভাবে স্তোত্র পাঠ করিবে, ভাবিতে মনে যেন নাট্য-রস-সম্ভোগের কৌতুক সঞ্চারিত হয়। ভগবান্‌কে দেখিতে চাহ, ভাল কথাই ত! কিন্তু তার আগে চাহিয়া দেখ, খুঁজিয়া দেখ, আবিষ্কার করিয়া ধন্য হও যে, অজানা অচেনা অদেখা শ্রীভগবানের অশেষ গুণমহিমাবলির মধ্যে

ক্ষুদ্র আকারে হইলেও, কি কি গুণ এবং কি কি মহিমা তোমার মাতার ভিতরে, তোমার পিতার ভিতরে থাকিলে থাকিতে পারে এবং কি কি গুণও মহিমা তাঁহাদের বহু দুর্বোধ্য আচরণের পশ্চাদেশ হইতে কেবলি উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। মাতার সময়োচিত তিরস্কার বা পিতার পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসনটুকুই তাঁহাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নহে। অন্যত্রও তাঁহাদের একটী অতি বিরাট, অতি বিশাল, অতীব বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে।

আমার মতে পিতৃমাতৃভক্তিই জীবনের সকল সৎশিক্ষার প্রথম সোপান এবং ইহাকে প্রশস্ত সোপানও বলিতে পারি। পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীনের অন্যান্য বহু সদ্‌গুণ মরুভূমিতে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝর্ণার আত্মবিলোপের ন্যায় মিথ্যা এবং অসার্থক হইয়া যায়। পিতামাতার বিরুদ্ধে তোমার যত অভিযোগ আছে, সব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও আমি বলিব যে, এত সব সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্ব-জ্ঞান, ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা তোমাকে জীবনের সর্ব্বস্তরে মহিমান্বিত করিতে সমর্থ। আমি বলিয়াছি বলিয়াই কোনো কথা তোমার বিনা বিচারে মানিয়া নিবার প্রয়োজন দেখি না কিন্তু তুমি যদি লাভের খাতা আর ক্ষতির খতিয়ান লক্ষ্য করিয়া চল, তবে পরিণামে আমার কথার যথার্থ মূল্য একদা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি
৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বর্দ্ধমান লোকো-কলোনিতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে, কোনও এক গ্রামের মণ্ডলীর একটী সদস্য পায়ে পড়িয়া জিদাজিদি শুরু করিল যে, তাহাদের গ্রামে ভ্রমণ-তালিকা করিতেই হইবে। যেখানে প্রতি সপ্তাহে সমবেত উপাসনা হয় কিন্তু দুই তিন জনের বেশী তাহাতে যোগদান করে না বলিয়া শুনিতেছি, যেখানে সহ-সভাপতি, সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ সবাই নিজ নিজ পদে অভিষিক্ত আছেন কিন্তু কাহারও হাতে কোনো কাজ নাই, যেখানে প্রায় সকলেরই কোনও না কোনও কারণে পারস্পরিক বিবাদ, মনোমালিন্য, যেখানে পারিবারিক বিবাদ বা কাল্পনিক হিংসা বা ঈর্ষ্যাকে মণ্ডলীর পবিত্র আসরে পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে কাহারও বিন্দুমাত্র লজ্জা, দ্বিধা বা অনুতাপ নাই, যেখানে অনেকেই অনেকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া শুনিতেছি, যাহার ফলে একজনের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইলে অন্যেরা আসিতে পারে না বা চাহে না, সেখানে যাইবার জন্য পায়ে ধরিয়া জোরাজুরি করিলেই কি আমি যাইতে পারি? ঐ স্থানটার আমি বার কয়েক গিয়াছি। দেখিয়াছি, গ্রাম্য অশিক্ষিত নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকদের মতন অবুঝ ও অসহিষ্ণু ইহাদের মনের গঠন, কেহ কাহাকেও সহ্য করিবে না তথাপি মণ্ডলী একটা রাখিবেই। আমি আমার অ্যাসবাসাডার বা জীপটী নিয়া কত বার যে এই স্থানটার উপর দিয়া গিয়াছি, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু নলকূপ হইতে এক পাত্র পানীয় জল নিবার জন্যও ওখানে দুই মিনিটের জন্য থামিতে সাহস পাই নাই। ইহাদের কলহের কুটিল প্রকৃতি দেখিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বুঝিতেছে যে, নিজেদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি কলহকে মণ্ডলীর মধ্যে আনিয়া প্রবেশ করান উচিত নহে, কিন্তু তথাপি প্রতীকারের

চেষ্টা নাই। এমতাবস্থায় ঐরূপ দূষিত স্থানে আমার শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধন একান্তই অনুপযোগী প্রস্তাব। কাছাড় জেলাতেও একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে, যেখানে মণ্ডলীর সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন নিদারুণ অশান্তি দেখা গিয়াছে যে, ধীমান্ ব্যক্তিরা আমার নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে, আমার নিকটে তাঁহাদের দীক্ষিত হইবার বড়ই সাধ কিন্তু আমার শিষ্যদের মধ্যে এই সংক্রামক কদর্য্য ব্যাধিটি দেখিয়া তাঁহারা নিজেদের আত্মিক ক্ষতির আশঙ্কাতে এখনো অদীক্ষিত রহিয়াছেন। সকলেই জানে যে আমি পরবর্ত্তী কালে কাছাড়ের প্রতিটি ভ্রমণে ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের তালিকা করিতে বিরত রহিয়াছি। সম্ভবত: আমার পরবর্ত্তী ভ্রমণেও ঐ স্থানটীতে আমি যাইব না।

পায়ের একটা আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিণ হইলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে ঐ আঙ্গুলের চেয়ে অনেক উর্দ্ধদেশেই কাটিয়া ফেলিতে হয়, এই জাতীয় মণ্ডলীগুলির রোগের অবস্থা ঠিক অনুরূপ। এই জন্য এমন সব স্থানে গিয়া শিষ্য-সংখ্যাবর্দ্ধন করিলে নবদীক্ষিত শিষ্যগুলিরই অকারণ অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। এই কারণে ধরিয়া লও যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীর যোগাযোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আমার কোনও প্রগ্রাম কদাচ হইতে পারে না কিন্তু তোমাদিগকে বারংবার যাইয়া যাইয়া সেখানে প্রত্যেকের চিত্তপরিশোধনে সহায়তা করিতে হইবে। অহঙ্কারের বিনাশ না ঘটিলে আর অনুতাপের উদয় না হইলে শুধু প্রতিজ্ঞার দাপটে চিত্তশোধন হয় না। ইহারা বিপদে না পড়িলে ভগবানকে ডাকে না। ভগবানকে না ডাকিলে অহমিকার বিনাশ ঘটে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

গুরুধাম কাঁকুড়গাছি
১১ ভাদ্র, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে একখানা কার্ড পাঠাইলাম। তোমাদেরই জেলা-নিবাসিনী তোমাদের এক গুরুভগিনী যে সময়ে নিজ গৃহে সমবেত উপাসনায় সকলকে লইয়া মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে তোমাদের অপর এক গুরুভগিনীর পুত্র তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। এমন একটা সংবাদও আমাকে শুনিতে হইল বলিয়া বড়ই দুঃখানুভব করিতেছি। তবে এইরূপ বিপদপাৎ সত্ত্বেও ভক্তিমতী কথিত ভদ্রমহিলা নিজের গৃহ হইতে সমবেত উপাসনার পাট তুলিয়া দেন নাই, ইহা বড়ই সুখের কথা।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে তোমাদের শিক্ষা-লাভ প্রয়োজন যে, সমবেত উপাসনাকালেও ঘরে পাহারা রাখা উচিত। দেশ চোরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় নামী লোকেরা প্রকাশ্যে চুরি করিয়া গর্ব্ববোধ করিতেছেন। ছোট ছোট গরিবেরা চুরি করাকে আর লজ্জাজনক বলিয়া মনে করে না। এই দেশের ভাগ্যে এত অধোগতি ছিল, তাহা আমরা ১৯০৫এ, ১৯১৪তে, ১৯২১এ বা ১৯৪২এ কল্পনাও করিতে পারি নাই। শুনিলাম, উল্লিখিত চুরির ব্যাপারটিকে দেশহিতৈষী যুবকেরা সমর্থন করিতেছে। চুরি, ছিন্‌তাই, গুণ্ডামীকে যদি দেশহিতৈষীরা সমর্থন করেন, তাহা হইলে দেশের রসাতলে নামিবার আর দেরী থাকে না। চৌর্য্য যদি বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক হয়, নিন্দনীয় না হয়, ডাকাতি

যদি বাহাদুরিরই ব্যাপার হয়, শাসনযোগ্য না হয়, তাহা হইলে জাতির অধঃপতন হইতে বাকী কি রহিল? যাহা হউক, তুমি পত্রখানা লইয়া পত্র-লেখিকার সহিত দেখা কর। স্থানীয় দুই চারিটী সজ্জনের সহিত আলোচনা কর। ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেম এবং দানবোচিত বিশ্বপ্রেম এমন ভাবে দেশের মগজগুলিকে অধিকার করিয়াছে যে, পার্টির কাজে যদি আশু-সহায়ক হয়, তাহা হইলে যে-কোনও অন্যায়কে সমর্থন করিতে কাহারও বিবেকে বাঁধে না। বিবেকের এই ক্রিয়াহীনতা জাতির চরম সর্ব্বনাশের অভ্রান্ত সঙ্কেত। স্থানীয় ভদ্র-সজ্জনগণের সহিত পরামর্শ-ক্রমে প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কৃত হউক। আমি এত দূর হইতে কোন পাতি দিতে পারিতেছি না।

এত কুকাণ্ডের পরেও যে তোমার ভক্তিমতী গুরুভগিনী নিয়মিত সমবেত উপাসনা পরিহার করেন নাই, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ঈশ্বরোপাসনা করিতে করিতে তাঁহার মনে শত্রুমিত্র সকলের প্রতি প্রেম ও ক্ষমার ভাব আসিবে এবং তাহার ফলে অন্তরে বিমল শান্তি তিনি আস্বাদন করিবেন। কিন্তু ইহার দরুণ অন্যায়ের প্রতিকার-ব্যাপারে গ্রামীণ সামাজিকবর্গের মানবিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব কিন্তু হ্রাস পায় না। আমি ক্ষমাশীল বলিয়া চোরকে, দস্যুকে, নর ঘাতককে কেহ দণ্ড দিবেন না, এইরূপ অবস্থায় দেশে ও সমাজে মাৎস্যন্যায় রাজত্ব করিয়া থাকে, দিকে দিকে বিশৃঙ্খল অরাজকতার জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে।

তোমাদের জেলায় যখন দীক্ষার হিড়িক লাগিয়া গিয়াছিল, তখনই আমি মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, ইহার কি জানি প্রতিক্রিয়া হয়। আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচয় হইবার আগেই দলে

দলে লোক দীক্ষার্থে ভিড় করিতেছে। তারপরে দীক্ষাগৃহে মাইক মারফত তোমাদের জনৈক গুরুভ্রাতার বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিলাম যে যত গরদা মাল দীক্ষাগৃহে ঢুকাইবার এক অসঙ্গত চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান ঘটনার তস্করটা যদি আমার দীক্ষিত শিষ্যদেরই অন্যতম হইয়া থাকে, তবে ত লজ্জার চূড়ান্ত হইবে। ত্রিপুরাতে লক্ষ অখণ্ড সৃষ্টির আন্দোলন চলিতেছে। অখণ্ড-তত্ত্ব এবং অখণ্ড-দর্শন সম্পর্কে জন-সমাজের মধ্যে প্রচুর জ্ঞান এবং ধারণা বিতরণের পরে একাজ চলিতেছে। সেখানে এই জাতীয় চুরির একটা ঘটনা ঘটিলে হাজার লোক আসিয়া প্রতিবাদ করিত। এমন ঘটনার কেন প্রতিবাদ হইবে না, ইহা বুঝিতে আমি একেবারেই অক্ষম। চরিত্রের ভিত্তি শক্ত না হইলে কেবল প্রচার আর সংগঠনের দ্বারা কিছু হয় না, সে কাজ বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা চতুর্দ্দিকে সচ্চরিত্রতার আন্দোলন সুরু কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৮০
(১৬-৯-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানায় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের পরীক্ষা দেওয়ার খবর আছে, আর আছে তোমার বেগুন ক্ষেতের প্রথম বেগুন বিক্রীর টাকার

খবর। ছেলে তোমার পরীক্ষা দিতেছে, ইহা আনন্দের কথা। আশীর্ব্বাদ করি, সে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হউক। আরও আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন জীবনে পরীক্ষাকে কখনো ভয় না করে, যে-কোনও রকমের পরীক্ষায় যেন সাহস করিয়া অবতীর্ণ হয় এবং ভগবানের দয়ায় জয়ী হয়।

তুমি তোমার বেগুন ক্ষেতের প্রথম ফসল বিক্রীর টাকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্যে দানের জন্য পাঠাইয়াছ। ইহার চাইতে আনন্দ-জনক সংবাদ আর কি থাকিতে পারে? তোমার মনটীর মত উদার, সরল, বদান্য ও জীব-হিতকারী মন যদি সকলের হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে আমরা সকলের সংযুক্ত সহায়তায় সকলের প্রায় সর্ব্বদুঃখ অনায়াসে দূর করিয়া দিতে পারিতাম। "প্রায়" বলিলাম এই জন্য যে, এমন কতকগুলি দুঃখও আছে, যাহা নিজের চেষ্টায় বা ভগবানের দয়ায় দূর হইতে পারে, বাহিরের কেহ দূর করিতে পারে না। অপরের যে দুঃখগুলি আমরা দূর করিতে পারি, সেইগুলি দূর করিবার ক্ষমতা আমাদের তখন বাড়ে, যখন আমরা বহুজনে একটী নির্দ্দিষ্ট সমবেদনায় একত্রীভূত হইয়া নিজেদের সর্ব্বশক্তি ঐ এক মহাকার্য্যে নিয়োজিত করি। সত্যযুগে তপস্যার যে বল ছিল, তাহাতে একক চেষ্টায় অনেক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ অসাধারণ জীবসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু এই যুগে সকলের ত্যাগ, সকলের তপস্যা, সকলের শক্তি, সকলের ইচ্ছা, সকলের আত্মোৎসর্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া একত্র করিয়া মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়।

তীব্র লক্ষ্য রাখিও মনের পবিত্রতার উপরে। কদাচ পবিত্রতা-ভ্রষ্ট হইও না। পুত্রস্নেহ, পত্নীপ্রেম, জীবে দয়া, দেশসেবা, সংসার প্রতিপালন, ঋণ পরিশোধ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, প্রাপ্য আদায় ও

সামাজিকতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের নানা-ভিন্ন-স্তরীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন-কালে মনকে নিরুদ্বেগ, সরস ও পবিত্র রাখিও। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা নিজ শুভ-বুদ্ধি ও শুচি-সংস্কার পুত্রকন্যাপরিজন প্রতিজনের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিও। তোমাদের অফিস-আদালত আর কৃষিক্ষেত্র সবই ঈশ্বরারাধনার মন্দির হইয়া উঠুক। তোমাদের প্রতিজনের জীবন এক একটী দিব্যায়তন আশ্রম-পীঠের রূপ ধারণ করুক। আমি আকৈশোর যে স্বপ্নোপন্যাস নিদ্রায় ও জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় দেখিয়া ও রটিয়া আসিতেছি, তাহার পুণ্যস্নিগ্ধ প্রেমোজ্জ্বল পরমসুন্দর নায়ক ও নায়িকা তোমরা প্রতিজনে হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩০ ভাদ্র, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সাত মাস আগের পত্র অদ্য আমার হাতে পড়িল। তুমি তারিখটী এমন ভাবে লিখিয়াছ, যাহাতে মনে করিতে পারি যে, ইহা উনিশ মাস আগের পত্রও হইতে পারে। এত পত্র আসে যে পড়িয়া কূল পাই না। বিলম্বের জন্য দুঃখ নিও না।

পরীক্ষায় ভাল মার্কস্ পাও নাই। এজন্য নিজের অভিলষিত বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাইলে না বলিয়া মনে দুঃখ রাখিও না। যে

বিষয়ে পাঠ নিতেছ, মন দিয়া তাহা আয়ত্ত কর। ইহার ফলে তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ আসিলেও আসিতে পারে। হতাশার মত পাপ নাই। কখনো হতাশ হইবে না।

তোমার মায়ের উপাসনায় আর তেমন মন নাই, আগের মতন আগ্রহ নিয়া উপাসনায় বসে না, শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। তবে, সে একটা গুরুতর অসুখ হইতে উঠিয়াছে। তারপরে তার আচরণকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতে যাইও না। মৃদু মধুর বচনে তাহাকে তাহার চিরদিনের আচরিত ভগবৎসাধনের দিকে আকৃষ্ট কর। তোমার মা গুণহীনা নহেন, বলিতে পার ভাগ্যহীনা। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিও, ভালবাসিও, স্নেহ, প্রেম, সমাদর দিয়া তোমার বুকের কাছে আঁকরিয়া ধরিয়া রাখিও। মাকে ভুল বুঝিও না।

দীন, দুঃখী, দরিদ্রদের তুমি সেবা করিবে, তোমার এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পরমেশ্বর পূর্ণ করুন, আমি এই প্রার্থনা করি। ডাক্তার হইলেই দরিদ্রের সেবা করা যায়, অন্য কিছু হইলে করা যায় না, এই ভ্রম মন হইতে দূর কর। তবে বর্ত্তমানে তুমি যাহা পড়িতেছ, তাহাতে খুব ভাল ফল করিতে পারিলে ডাক্তারি পড়িবার সুযোগ তোমার মিলিয়া যাইতে পারে।

আমি কোথাও গেলে লোকে পয়সা খরচ করিয়া সামিয়ানা কেন টানায়, সতরঞ্জি ত্রিপাল কেন পাতে, এ প্রশ্নের জবাব কি করিয়া দিব? যাহারা এরূপ প্রশ্ন করে, তাহাদিগকে বলিও, তাহারা যেন তাহাদের বাড়ীতেই আমাকে নিমন্ত্রণ করে। আমার আহারীয় আমি নিজেই সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইব কিন্তু লোকের ভিড় হইলে তাহাদের বসিবার জন্য, লোকে কথা শুনিতে চাহিলে তাহাদিগকে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার

জন্য নিজের বাড়ীতে যেন দুই একটা বড় আম্রবৃক্ষ বা অশ্বত্থ পুতিয়া রাখে। তাহা হইলেই প্যাণ্ডাল রচনা করিবার জন্য অর্থব্যয় হইবে না। ধনীর বাড়ীতে আমার যাতায়াত খুব কমই হয়। সুতরাং গৃহস্থকে অর্থের অপচয় হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা যে আমার কর্ত্তব্য, একথাটা আমি স্বীকার করি। আমি ট্রামে-বাসে না চাপিয়া বর্ত্তমানে কোনো কোনো স্থানে "কারে" কেন যাই, রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় না উঠিয়া কোনো কোনো সময় প্রথম শ্রেণীতে কেন উঠি, এই প্রশ্নও অনেকে করে। আবার আমার ঘড়ির চেইনটা সোণার কেন নয়, আমার দুই হাতে আটটা সোণার আংটি কেন নাই, এই প্রশ্নও কেহ কেহ করে। আমার রাত চারিটায় কেন ঘুম ভাঙ্গে, সারা দিন কেন চিঠি লিখি, অথবা ছাতামাথায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া মঙ্গল-সাগরের মাটি কাটা আর দালান গাঁথা কেন দেখি, এই প্রশ্নও অনেকে করে। সকল প্রশ্নেরই কি জবাব হয়? একটা বাজে প্রশ্নের যদি জবাব দাও ত দশটা নূতন প্রশ্ন গজাইবে। সুতরাং এসব বাজে কথা শুধু শুনিয়া যাওয়াই ত ভাল, জবাব দিয়া কোন্ লাভ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩১ ভাদ্র, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানকার মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। গত বৎসর তোমরা যে নিষ্ঠার সহিত মণ্ডলীর

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ, আগামী বৎসর তোমাদের কৃতিত্ব সেই গৌরবকেও যাহাতে ম্লান করিয়া দিতে পারে, তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজনে চলিও। কেহ সভাপতি বা সম্পাদকের পদাধিকারী হইয়াছে বলিয়া দায়িত্ব যে একা তাহাদের, তাহা নহে। দায়িত্ব প্রত্যেকেরই আছে। প্রতিজনকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে নিয়ত উদ্বুদ্ধ রাখাই সম্পাদকের কাজ এবং প্রত্যেকের সম্মুখে আদর্শকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া উপস্থাপিত করা হইতেছে সভাপতির কাজ। আমার উপর্যুক্ত কথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সর্ব্বশক্তি মণ্ডলীর সেবার ভিতর দিয়া আত্মোৎকর্ষ-বিধানার্থে এবং নিখিল জগতের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হও।

বেশ কিছুদিন আগে তোমাদের গ্রামে আমার ভ্রমণ-তালিকা হইবার প্রস্তাব রটিয়াছিল। আমিও প্রস্তুত হইতেছিলাম। তোমাদের উৎসাহ উচ্চকোটিতে আরোহণ করিয়া তোমাদের অনেককে বারংবার আলোচনায় এবং প্রচার-সংগঠনে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। দৈবক্রমে সেই সময়ে আমার যাওয়া হয় নাই বলিয়াই কেহ মনে করিও না যে প্রস্তাব একেবারেই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

তোমাদের সেই অত্যুৎসাহ-সবল আলোড়নের সময়ে ঐস্থান হইতে একটী বেসুরা রাগিণীও আমার কর্ণে ধ্বনিত করা হইয়াছিল। একজন কেহ আমাকে পত্র লিখিয়া মণ্ডলীর কর্ম্মী ও কর্ম্মকর্ত্তাদের কতকগুলি ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, মণ্ডলী যত গর্জ্জিতেছে, তত বর্ষিবে না। খবরটা অনাবশ্যক বলিয়াই আমি তখন তোমাদিগকে তাহার ছন্দাংশও জানিতে দেই নাই।

এই বিষয়ে আমার মন্তব্য এই যে, ত্রুটিহীন যেমন মানুষ হয় না, ত্রুটিহীন তেমন মণ্ডলীও হয়ত হয় না। কিন্তু যে ত্রুটি যে মণ্ডলীর মধ্যে

আছে, সেই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই সজাগ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রয়োজন ত্রুটিটিকে বা ত্রুটিগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন ত্রুটিসংশোধনের উপায় অবলম্বন করা। নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের মধ্য দিয়া আলোচনা করিয়া দ্রুত তাহা সংশোধনে নামিতে হইবে। সমালোচকের ভূমিকা নিয়া দূরে দাঁড়াইয়া টিট্‌কারী দেওয়া কাহারও চলিবে না, কর্ম্মীর ভূমিকা নিয়া প্রত্যেককে কোদাল হস্তে ক্ষেত্রে নামিতে হইবে এবং গায়ে কাদামাটি মাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

আমার এই পত্রখানা মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত প্রত্যেক বিচারবান্ ব্যক্তিকে পাঠ করিয়া শুনাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর পুপুন্‌কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কলিকাতায় যে কয়টা দিন থাকি, যেন সমগ্র ভারতের বাঙ্গালী সমাজের অন্তরের চিত্রটা একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই। কত দিন তোমাদের মধ্যে যাইতে পারি নাই কিন্তু গুরুধামে বসিয়া দেখিতে পাইয়াছি, তোমাদের মন কত চঞ্চল, তোমাদের প্রাণে কত

উদ্বেগ, তোমাদের জাগ্রতে কত সতর্কতা, তোমাদের নিদ্রায় কত দুঃস্বপ্ন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরাজ-রাজত্বেও ছিল, প্রাদেশিকতা স্বাধীনতা-লাভের এক পরম উপাদেয় পরিণাম, ইহার পরে আবার অন্যান্য নূতন নূতন উপদ্রব নানা নামে নানা রূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তোমরা কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছ না।

মনের এই চঞ্চল অবস্থার জন্য তোমরা কোনও অঞ্চলেই কেহ জনকল্যাণমূলক কোনও অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইতেছ না। যে যখন সুযোগ পাইতেছ, উপক্রান্ত বেষ্টনী ভেদ করিয়া তাহার বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছ। সমস্ত জীবনের শ্রমলব্ধ ভবিষ্যৎ ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে।

কিন্তু পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হউক, এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে কখনো ঘটিবে না যে, এক দেশে বা এক অঞ্চলে কেবল এক-জাতীয় মানুষেরাই বাস করিবে, অন্য-জাতীয়েরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সৃষ্টির বিচিত্রতা বিধাতার বিধান, অতএব একই দেশে বা একই অঞ্চলে বিচিত্র-ভাবের ভাবুক, বিচিত্র-ভাষার ভাষী, বিচিত্র-ধর্ম্মের যজন-যাজনা-কারী রং-বেরং-এর মানুষেরা স্বভাবেরই ধর্ম্মে থাকিয়া যাইবে। স্বাভাবিকতার এই পরিণামকে প্রত্যেকে অকুণ্ঠ চিত্তে বিশ্বাস কর। তারপরে প্রতিবেশীদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন কর।

তোমাদের ওখানে অখণ্ডমণ্ডলী এখনো উঠিয়া যায় নাই এবং কখনো উঠিয়া যাইবে না। তোমরা স্থানীয় ভাষায় অখণ্ড-সংহিতা ও অখণ্ড-বাণী সমূহের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া প্রচার করার বিষয়টা ভাবিয়া দেখিও। গৌহাটিতে ধনীরাম অসমিয়া ভাষায় এবং ভুবনেশ্বরে গৌর-চন্দ্র ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার সুরু করিয়া দিয়াছে। তত্তৎস্থানীয়

অথণ্ডেরা উহাদিগকে চারিদিক হইতে পৃষ্ঠপোষণ করিয়া গেলে আস্তে আস্তে একটা নূতন দিগন্তের সৃষ্টি এবং প্রসার ঘটিতে পারে।

সমবেত উপাসনাগুলি নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইও। আমাকে প্রচার করিবার সুলভ চেষ্টায় কেহ নামিও না, উহা আমি চাহি না, উহার উপযোগিতাও কিছু নাই। আদর্শকে প্রচার করিবার দিকে প্রতিজনে দৃষ্টি দাও। ভারতবর্ষ মূলতঃ অবতারবাদের এক অত্যাশ্চর্য্য খনি-বিশেষ। এদেশে আদর্শ-প্রচার সহজে দানা বাঁধে না কিন্তু ব্যক্তিপূজার প্রচার সুরু করিলে অনুগামীর ভিড়ে রাস্তায় জাম বাঁধিয়া যায়। মনে রাখিও, আমি তোমাদের পূজা চাহি না, আমি চাহি, জগতের মহত্তম কর্ম্মে তোমাদের আত্মসমর্পণ, আত্মনিয়োজন, আত্ম-বিসর্জ্জন। আমাকে পৃথিবীর লোক আমার মৃত্যুর দ্বাদশ দিবস পরেই যদি চিরতরে ভুলিয়া যায়, তবে তাহাতে আমার কোনও ক্ষোভ থাকিবে না। কিন্তু তোমরা আদর্শটীকে শক্ত হাতে ধরিয়া রাখিও।

আমি আমার কাজ নীরবে করিয়া যাইতেছি। কয়েকদিন হয় কুমড়ী গ্রামের দুর্ব্বৃত্তেরা বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত মমতা-বাঁধটী ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। আমি এখনো ঘটনাস্থলে যাই নাই। মঙ্গল-বাঁধের উপরে নির্ম্মীয়মাণ মালটিভারসিটি আমার সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। একদিন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে মঙ্গলসাগর যে ভাবে জলহীন শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, আজ দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারে মমতা-সাগরেরও ঠিক সেই দশাই নাকি হইয়াছে। কৈ, এত সত্ত্বেও ত আমি স্থানত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে প্রবাসী হইবার কল্পনা করিতে পারি নাই! তোমরা আমার দৃষ্টান্তটী কি অনুসরণ করিতে পার না! ভালবাসিব সর্ব্বজাতিকে। ভালবাসার বলেই সব দেশে বাস করিব,

ভালবাসার বিনিময়ে মৃত্যুও যদি প্রাপ্য হয়, তবে তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুনকী আশ্রম
৩১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৮০
(১৭-৯-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মেহনতে আমার কসুর নাই, ফাঁক পাইলেই কাজ করি। একটা বা এক রকমের কাজ নয়। হাজার কাজ, হাজার রকমের কাজ। এজন্য সর্ব্বদাই পত্রের স্তূপ জমিয়া থাকে। উত্তর সময়মত না পাইলে কেহ বিরক্ত হইও না।

সকলে যদি সকলের কাজ সময়মত করিয়া রাখে, তাহা হইলে আমার শ্রম ও উদ্বেগ কমিয়া যায়। যে কোনও কাজে তোমাদের ঐক্য-জনিত মিলন আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য।

তোমাদের কাহারো কাহারো চেষ্টায় সমবেত উপাসনায় যোগদানকারী উপাসক-উপাসিকাদের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়িতেছে জানিয়া আমার তৃপ্তির অন্ত নাই। এই একটী কাজে যাহার আগ্রহ, ভবিষ্যতে

৯

তার কাছে ছোট-বড় অনেক ভাল কাজের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। হেলায় খেলায় কত মূল্যবান্ সময় মানুষের অপচয়িত হইয়া যাইতেছে, তার দিকে লক্ষ্য নাই, আর সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবার বেলাই লোকে সময় পায় না, ইহা এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

উপাসনা-কালে শান্তি, শৃঙ্খলা ও মনোনিবেশের অক্ষুণ্ণত্ব বজায় রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিও। লাখ লোক জুটাইতে পার না, মাত্র দশ জনেই জুটিয়াছ, কিন্তু এই দশজনেরই মন একাগ্র ও ঈশ্বর-মুখী থাকা প্রয়োজন। অসাত্ত্বিক মনটাকে উপাসনা-মণ্ডপের সীমার বাহিরে রাখিয়া আসিয়া উপাসনায় বসিবে। জয়ধ্বনি দিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু হইল কি সকলে একেবারে নীরব নিঃস্তব্ধ হইয়া উৎকর্ণ হইয়া পাঠ-শ্রবণে লাগিয়া যাইও। স্তোত্রাদি পাঠ-কালে সকলে সকলের সহিত সুরের ও লয়ের সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করিও। শুদ্ধ সুর শিক্ষার সুযোগ নিয়া অভ্যস্ত হইলে বহু জনের মিলিত কণ্ঠস্বরও এলোমেলো হইবে না। প্রসাদ বিতরণ-কালে হৈ-চৈ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞান করিও এবং তরুণ-বৃদ্ধ সকলকে এই বিষয়ে উপদেশ দিও। সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে করিতে তোমাদের প্রতিজনের মনের গঠন পরিবর্তিত হইতে থাকুক, ইহাই আমি চাহি। তাহার ফল সর্ব্বজীবের পক্ষে শুভ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা আশ্বিন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জটিলতামুক্ত পথই কর্ম্মের সরল পথ। যে-কোনও বিষয়ে মতভেদ, মনোভঙ্গ, ভুল-বুঝাবুঝি অতিক্রম করা যায়, যদি কূটনীতিবর্জ্জিত সরল পথে সকলের মধ্যে অকপট আলোচনা হয়। সেই পথই তোমরা সর্ব্বদা আশ্রয় করিও।

এখানে আমি দারুণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছি। সব সঙ্কট লেখনীমুখে প্রকাশ সঙ্গত নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিবে। বনের ভিতরে মমতা-সাগরে জলরাশিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে মমতা-বাঁধ দিয়াছিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুর্ব্বৃত্তেরা তাহা ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। মঙ্গল-সাগরের এই ক্ষতি কেহ করিতে পারিবে না, কারণ ঐ সাগরের কোলের উপরে আমরা বসিয়া আছি। একটী একটী করিয়া কয়েকটী কর্ম্মীর অবসান বা অন্তর্ধান হইয়া গেল, জনবল ক্ষীণ। এক বস্তা সিমেন্ট কোথাও পাইতেছি না যে, অত্যাবশ্যকীয় অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত শেষ করিয়া ফেলি। গতকাল মালটিভারসিটির জন্য অর্ডার দেওয়া চারিটি প্রিন্টিং মেশিনের মধ্যে একটী আসিয়া আশ্রমে পৌঁছিল, অথচ মুদ্রণ-ঘরের ছাদ তৈরী করিতে পারিতেছি না। পাঁচ আর দশ বস্তা সিমেন্টের জন্য দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিকদের কাছে আজ চাশ, কাল ধানবাদ দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে প্রেমাঞ্জনের নূতন জুতা

পুরাতন হইয়া গেল,—প্রতিদিন তাহাকে শূন্য হস্তে ফিরিতে হইতেছে। আজ যাহা পাইলাম না, কাল তাহা পাইলে পাইতে পারি, এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া আশ্রমের ছেলেগুলি ট্রাকটার লইয়া দিগ্‌বিদিকে হন্যে কুকুরের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে।

এমতাবস্থায় আমি কি রুচি বোধ করিব, তোমাদের স্থানে স্থানে কে কোথায় কি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া তোমাদের সঙ্কল্পিত কর্ম্মোদ্যমে যতিভঙ্গ করিতেছে, তাহার মধ্যে মাথা গলাইতে? তোমরা এমন সরলতা, সরসতা, স্বাভাবিকতা ও হৃদ্যতার পারস্পরিক অনুশীলন কর, যাহাতে অকারণ ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টিই না হইতে পারে।

একই কাজ নিয়া যখন বহু জন বহু দিক হইতে শ্রম বিনিয়োগে প্রবৃত্ত, সেই সময়ে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সরল সাবলীল স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ করিবার অভ্যাস অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং লাভবর্দ্ধক। তোমরা এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিও। নিজেদের মধ্যে সরল যোগাযোগ না থাকিলে তোমাদের অনেক শ্রমই বৃথা যাইবে, অনেক অধ্যবসায়ই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। শ্রমের ও শক্তির, বুদ্ধির ও চেষ্টার এই অপচয় হইতে প্রত্যেকে আত্মরক্ষা করিয়া চল। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা আশ্বিন; বুধবার, ১৩৮০
(১৯-৯-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। গতকাল সন্ধ্যায়

আশ্রমের প্রথম মুদ্রণ-যন্ত্রটী সাতটী বিরাট বিরাট প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হইয়া ভরিয়া রেল-ষ্টেশান হইতে আশ্রমে আসিয়া পৌছিল। মালটি-ইউনিট বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের বিদ্যার্থিগণের মুদ্রণ-শিল্প-শিক্ষণের সৌকর্য্যার্থে আরও তিনটী মুদ্রণ-যন্ত্র ক্রমে ক্রমে আসিবে, অগ্রিম কিছু টাকা দিয়া অর্ডার বুক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলা ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসে এই কল্পনাটী করিয়াছিলাম, আর পূর্ণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে ১৩৮০র আশ্বিন মাসেই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইবার প্রথম সূচনা হইল। সাধনা আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, আশ্রমের অন্যান্যেরা আনন্দে প্রায় নাচিয়াছে। বিদ্যামন্দিরে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যন্ত্রের রূপ ধরিয়া কাল সন্ধ্যায় আশ্রমাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। মনে হইতে লাগিল, মাতা সরস্বতীর স্বর্ণবীণা ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছে। ভরবের ভার হইবে সেই ছাত্রগুলি, যাহারা দৈনন্দিন পাঠ্য বিষয়গুলি আগে কম্পোজিং ষ্টিকে ফেলিয়া রচনা করিয়া লইয়া নিজেদের পাঠ্যপুস্তক জনে জনে কিনিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমি আমূল রূপান্তর ঘটাইতে চাহি, যাহা আমার পূর্ব্বে অধিকতর শক্তিধর কেহ কেহ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই চাওয়ার ইতিহাস বড়ই গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু কাহারও নকলনবীশ হইবার রাস্তা আমার জন্য খোলা নাই। কারণ, আমি আজীবন চাহিয়া আসিয়াছি জীবনকে, জীবনের ব্রতকে, জীবনব্যাপী জনসেবাকে, ভবিষ্যৎ আদর্শকে এবং দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যৎকে পূর্ণ স্বাবলম্বনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ছাত্র কি লেখাপড়াই শিখিবে? সে কি তাহার শিক্ষার ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য কোনও কিছু করিবে না? ধনোৎপাদনের দিক দিয়া সে কি তাহার দরিদ্র পিতামাতার সম্যক্

মুখাপেক্ষী হইবে? বিদ্যার্জ্জনের সাথে সাথে সে কি অন্নার্জ্জন করিবে না? শিক্ষান্তে সে কি চাকুরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিবে, সে শিক্ষা কি সে পাইবে না, যে শিক্ষা তাহাকে ডিগ্রী ব্যতীত নিজের মহিমাতেই ব্যবহারিক জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা সঙ্গত ভাবে প্রদান করিবে? সে কি কেবল নিজে বাঁচিবার জন্যই শিক্ষার্জ্জন করিবে? তার বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে আরও দশ জনকে বাঁচিবার জন্য যে গৌণ ভাবে সহায়তা করা যায়, তাহার তত্ত্ব ও রহস্য কি আয়ত্ত করিবে না?

কাল ছিল মাস-পয়লা। এজন্য সাধনার আনন্দ অধিক হইয়াছে। কাল ছিল মঙ্গলবার। এজন্য তাহার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মা মঙ্গলময়ী বিদ্যাদায়িনী মহাদেবী রূপে নিখিল ভুবনে নিজ যোগ্য পীঠস্থানে সমাসীনা হউন, আমার ইহাই আকিঞ্চন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

বারাণসী

২১শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮০

(৮-১০-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে বিজয়ার স্নেহ ও আশিস নিও।

একটা জাতি, সমাজ বা সঙ্ঘ যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন তাহার ভিতরে কতকগুলি আপৎ-কালীন লক্ষণের বিকাশ ঘটে। প্রথম

লক্ষণ চরিত্র-চ্যুতি। দ্বিতীয় লক্ষণ সরল সহজ স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ না করিয়া কূট-কৌশলের প্রতি অধিকতর রুচি। তৃতীয় লক্ষণ নব-যুবকদের মধ্য হইতে নূতন নূতন প্রতিভাশালী কর্ম্মীর আবির্ভাব কমিয়া যাওয়া এবং বৃদ্ধদের উপরে যাবতীয় সমস্যার সমাধানের অনুচিত ভার ও দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া। চতুর্থ লক্ষণ আত্মকলহ।

চারিদিকে তাকাইয়া দেখ যে, উপরিবর্ণিত লক্ষণগুলিই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছ কি না।

এই সময়ে যুবকদের মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। প্রবেশ করিতে হইবে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী লইয়া, প্রবেশ করিতে হইবে প্রাণভরা আশা লইয়া। অন্য কোনও চটকদার Stunt আমাদের হাতে নাই, জানিও।

উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলটুকু নিয়া সেখানে শাহান্‌শাহ হইয়া বসিতে চাহে। কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নহে, তোমাদের থাকিবে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা। দেশকে, জাতিকে, জগৎকে তোমাদের ক্ষুদ্র সঙ্ঘের সীমিত শক্তি দিয়াই সীমাহীন সেবা দিবার থাকিবে তোমাদের আকূতি।

মাঝে মাঝে ছুটির ফাঁকে চারিদিকের গ্রামগুলিতে এবং শহর-সমূহে ছুটিয়া যাও। তথাকার সমভাবের ভাবুকদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাদের প্রতিজনের হাতে ছোট ছোট সম্মানজনক কাজ দাও। তাহাদিগকে সৎ হইয়া চলিতে প্রেরণা দাও। পর পর কয়েকটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তোমাদের মনের ভিতরে যে দৌর্ব্বল্য জাগিয়াছে, তাহাকে এভাবে দূর কর। কেবল নিজেদের পৌরুষের উপরে আস্থা দিয়াই এত বড় সমস্যার সমাধান হয় না। নিজেদের মধ্য হইতে দলাদলিকে

একেবারেই নির্ব্বাসন দিতে হইবে এবং সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মানব-সমাজ তোমারই আত্মীয়-পরিজন বা গোষ্ঠী-স্বজন, এই ধ্যানকে নিজ নিজ ব্যবহারে রূপ দিতে হইবে। তোমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হও, তাহা হইলেই ইহা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মন কখনো ছোট হয় না। আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসে ঘাটতি আছে বলিয়াই ত আমরা মানুষকে ছোট ভাবি এবং নিজের কাছে নিজে ছোট হইয়া যাই।

ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের উপরে তোমরা জোর দিও। যে যেই অঞ্চলে বাস কর, সে সেই অঞ্চলের ভাষায় আমার ব্রহ্মচর্য্য-সম্পর্কিত বাণীগুলি অনুবাদ করিয়া তত্তদ্দেশীয় যুবকদের মধ্যে বিতরণ কর। একাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া যাইতে থাকিলে নূতন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট নবযুবকেরা তোমাদের চির-সহোদর হইয়া কাজ করিবে। নিজেদের মধ্যে নানা ভাবে কলহ করিয়া তোমরা নিজেদের স্বভাব খারাপ করিয়া ফেলিতেছ, অন্য দিকে কাজের সময়ও হারাইতেছ। পরস্পরের মধ্যে মতের অমিলটা কোথায়, তাহা নিয়া মাথা না ঘামাইয়া পরস্পরের মধ্যে মতের মিল কোথায় কোথায়, তাহা খুঁজিয়া নিয়া তোমরা কর্ম্মপন্থা নির্ণয় কর। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া একটু পায়চারি করিতে না করিতেই আবার বারান্দার মাটিতে ঘুমাইয়া পড়া নেশাখোরেরই সাজে, তোমাদের সাজে না। মৃদু কশাঘাতে চারিদিকের অলস্-স্বভাব যুবকদের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের বাণী লইয়া অগ্রসর হও। দেখিও, সাফল্য এই পথেই আসিবে। জাতি যতই জাহান্নমে গিয়া থাকুক না কেন, প্রাচীনের সত্য নবীনের জীবনে মৃত্যুহর সুধার কাজ করিবেই করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

বারাণসী

২১ আশ্বিন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পীড়ায় পড়িয়াছ। আমার শরীরও পীড়িত। মাসাধিক কাল অতি কষ্টে কাজকর্ম করিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু কাল ইলেকট্রোকার্ডিও-গ্রামে হৃৎপিণ্ডের গুরুতর দোষ ধরা পড়িল। সতর্ক হইয়াছি কিন্তু বোধ হয় অতি বিলম্বে। আমারও শরীরের দশা প্রায় তোমার মতন, তবে ইহা নিয়াও যেন অভ্যাসের বশে কাজ কিছু কিছু করিয়া যাইতেছি।

ঘরে ওঙ্কার-বিগ্রহ থাকিলেই তাহার পূজার্চ্চনা করিতে হইবে, তাহা নহে। তবে, অনাদরণীয় স্থানে, অবহেলায় মধ্যে তাহা রাখা উচিত নহে। বিগ্রহ ঘরে রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে নিরন্তর নাম স্মরণের সহায়তা পাওয়া। আশা করি, এই কথাটী প্রত্যেকেই সহজে বুঝিতে পার।

ওঙ্কার-মন্ত্র জগতের সকল মন্ত্রের সার, সমাহার, সমন্বয়, আদি এবং অন্ত। ওঙ্কারের ভিতরে সর্ব্বমন্ত্র, সর্ব্বতত্ত্ব, সর্ব্বসত্য বিরাজমান। এই জন্যই ইহার কৌলীন্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। ইহার আশে পাশে আবার প্রতিদ্বন্দ্বী দেববিগ্রহাদি রাখিবার কোনও প্রয়োজনীয়তাই নাই। ইহাকে সমাদরের সহিত রাখিতে হইবে। রাখিলেই যে পূজা করিতে হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি নাই।

ক্লেশকর শারীরিক অবস্থায় বসিয়া বসিয়া নামজপ করিতে না পারিলে শায়িত অবস্থাতেও নামজপ চলে। ইহাতে দোষ হয় না।

বসিয়া নামজপের মত শারীরিক সামর্থ্য যতদিন না আসিতেছে, ততদিন শায়িত অবস্থায়ই অবিরাম নামজপ করিয়া যাও। নামেতেই দেহ মন প্রাণ অর্পণ কর।

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দ্রুত সুস্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

বারাণসী
২৩ আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮০
(১০-১০-৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তিন চারি মাস ধরিয়াই দুর্ব্বলতা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। তাহা খুব বাড়িয়া যাওয়াতে হৃৎপিণ্ড-বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইয়াছি। তিনি চলাফেরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার পত্রখানার খোঁজ নিতে পারি নাই।

কি লিখিয়াছ, অনুমান করিতে পারিতেছি। যে দায়িত্ব পাইয়াছ, তাহা সুষ্ঠু রূপে সম্পাদনের চেষ্টা করিও। সকলের সহিত প্রসন্ন সদ্‌ব্যবহার করিও এবং জিদের বলে নহে, প্রেমের বলে সকলকে আকর্ষণ করিও। তিল তিল করিয়া কাঁকর-পাথর জমাইয়া হিমাচল হয়, বিন্দু বিন্দু করিয়া সিন্ধু হয়, এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া জমাইতে

জমাইতে লোকে কোটিপতি হয়। ধর্ম্মীয় সদাচার এবং সাত্ত্বিক সদ্বুদ্ধি সম্পর্কেও সেই কথাই খাটে। প্রীতির অনুশীলন কর, সকলকে বুঝিতে দাও যে, তুমি তাহাদের প্রতিজনের ভাই। প্রতিজনের নেতা হইতে চেষ্টা করিও না। নেতা সাজিলেই অহঙ্কার আসে, অভিমান আসে, মান-যশ-প্রতিপত্তির প্রশ্ন এবং দাবী আসে, অন্য নেতৃত্বাভিলাষীর সহিত সংঘর্ষ আসে এবং অন্য যোগ্য লোককে দমন করিয়া রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিবার উদ্দাম দুর্ব্বাসনা আসে। নেতৃত্বের ললাটে ছাই ঢালিয়া দিয়া তুমি সকলের সেবক হইবার চেষ্টা কর। নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

বারাণসী
২৪ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০
(১১-১০-৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা –, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অখণ্ড-সংহিতা-পাঠ-প্রকল্পানুযায়ী কাজ নিয়মিত চলিয়া অষ্টম সপ্তাহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আরও আনন্দিত হইলাম ইহা দেখিয়া যে, অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীমান্ বীরেশ্বর চাকলাদার যুবকের শক্তি লইয়া তোমাদের সঙ্গে কাজ করিতেছে। সে কেবল বংশে আর বয়সেই কুলীন নহে, সে জ্ঞানবৃদ্ধও বটে। তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত কর। যে

কাজ ধরিয়াছ, তাহা ধারাবাহিক ভাবে সম্বৎসরকাল তোমাদের চালাইতে হইবে।

শুনিলাম, তোমাদের অঞ্চলের সম্মেলনে জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। সাধারণতঃ খিচুড়ীর আয়োজনটা বেপরোয়া হইলে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বড় হইয়া যায়। সম্মেলনের আলোচনা শুনিবার জন্য কেহ দেরী করিতে পারিল না, কিন্তু খিচুড়ীর পংক্তিভোজনে হুড়াহুড়ি করিয়া বসিতে হয়ত কাহারো লজ্জাবোধ হয় নাই। এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্লজ্জ বেহায়াদের নিয়াই যখন আমাদের কাজ করিতে হইবে, তখন কাজে ঢিলা দিলে কোনও প্রকারেই চলিতে পারে না। যে কাজ তোমরা ধরিয়াছ, তাহা আর ছাড়িও না। * * * কাজে নামিয়া আর কাজে ক্ষান্ত দিতে নাই। অবিরাম ধারাবাহিক কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১২ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮০
(২৮ নবেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * *

তোমার এক অখণ্ড-ভাই পুত্র-বিবাহের ভাবী বধূ মনোনীত করিয়াছেন এবং অখণ্ডমতে বিবাহ দিতে চাহেন। নিশ্চয়ই এই

প্রস্তাব সাধু। তোমরা সকলে এই শুভ অনুষ্ঠানে সহযোগ ও সাহায্য করিও। বিবাহ একটী পবিত্র অনুষ্ঠান, যাহার মাধ্যমে যুগে যুগে যুগাবতার মহাপুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। ভাবী কালের কুশলের দিকে চাহিয়া তোমরা প্রতিটি কাজ করিও, প্রতিটি কথা বলিও, প্রতিটি নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিও।

আমার হাতের একটুখানি স্পর্শ পাইয়া তোমার এক দৌহিত্র "পলিও" রোগ হইতে প্রায় নিরাময়ের পথে, এই সংবাদটী শুনিয়া খুবই সুখী হইলাম। তবে মনে রাখিও, এটা আমার হাতের গুণ নহে, ইহা ভগবানের নামের গুণ। তোমরা প্রতিক্ষণে তাঁহার নামে অধিকতর বিশ্বাসী ও নম্র হও, তোমাদেরও হাতের স্পর্শে হাজার হাজার নরনারীর দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হইবে। যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র হস্তস্পর্শে যাহা হইত, কিছুকাল আগেও লোকনাথ ব্রহ্মচারীর হস্তস্পর্শে যাহা হইয়াছে, তাহা তোমাদেরও হস্তস্পর্শে হইতে পারিবে। তোমরা সাধনশীল হও, [illegible] হও, নিঃস্বার্থ হও, নিরহঙ্কার হও, নির্ব্বিকার হও এবং নির্ব্বিধ হও।
* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

[illegible]

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। হৃৎপিণ্ডের খুব শক্ত অসুখে মাসাধিক কাল ক্লেশ পাইয়া শরীর খুব দুর্বল। সুতরাং দীর্ঘ পত্রের আশা করিও না।

যাহা-কিছু কাজ করিতেছ, বাক্যোচ্চারণ করিতেছ, চিন্তা-ভাবনা করিতেছ, তাহার কিছুই তুমি কর না, ভগবানই তোমাকে দিয়া করান,— নিরন্তর এইরূপ ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি ঠিক পথই ধরিয়াছ, এপথ ভ্রান্ত নহে। কিন্তু পরমেশ্বরই না করিতেছেন বা করাইতেছেন, একথা সত্য, না তুমি বা আমি পুরুষকারের বলে অনেক-কিছু করিতে পারি এবং করিতে বাধ্য, একথা সত্য, তাহার বিচারে তোমার প্রবেশের প্রয়োজন কি ? যে পরমেশ্বরকে ভার দিয়াছে, সে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই ত পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারে। জীবের পরমায়ু স্বল্প কালের, সুতরাং বৃথা বিচার-বিতর্কে কালাপহরণ না করিয়া কাজ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনিই যে সব করাইতেছেন, একথাটী ভাবিতেও এক কণা পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। সেই পুরুষকারটীকে পাপ, অপরাধ বা অন্যায় বলিয়া মনে করা সঙ্গত নয়।

তাঁহার নামযোগে নিজেকে নিয়ত তাঁহাতে অর্পণ করিতে থাক, তাম্র-চমস যোগে যাজ্ঞিক যেমন করিয়া হোমকুণ্ডে হবিঃ সমর্পণ করেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কারণ, লিখিয়াছ যে, জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া জন-সমাজে যোগ ও প্রাণায়ামের প্রচার করিতেছেন।

যদি শিক্ষাদান নির্ভুল হয়, তবে এর মত সুখকর সংবাদ আর কি আছে ?

তুমি ভাবিত হইয়াছ এই আশঙ্কাতে যে, যদি তোমার গুরুভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে কেহ এসব নূতন রকম-সকম দেখিয়া নিজের গৃহীত পন্থা ছাড়িয়া দেয়। আমার কোনও শিষ্য অন্য কোনও গুরুর মতর দেখিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে আমার দিক দিয়া আপত্তির বা বিরক্তির কোনও কারণ নাই। এই সব ব্যাপারে ও অবস্থায় আমি খুবই উদার, ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কেহ নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়া যদি আমার দেওয়া প্রকরণের চেয়ে ভাল পথ বা প্রকরণ পায়, সে যাউক না আমার গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া। তাহাতে আমার বা তোমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি এবং কোথায় ? সুতরাং এই সকল অবাস্তর বিষয় নিয়া দুশ্চিন্তা করিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। তবে, যাহারা আমার প্রদর্শিত পথেই নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিতে ভালবাসিবে, তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিব যে, কখনো থমকিয়া দাঁড়াইও না, থামিও না, সাধনে বিরতি দিও না, কাজ কেবল করিয়াই যাইতে থাক,—সূক্ষ্ম সাধনের কাজ বা সাধনাশ্রিত স্থূল জীবকল্যাণ কাজ।

সাধু-মহারাজ যাঁরা প্রচারিত মতামতের কোনও সমালোচনায় তোমাদের প্রয়োজন নাই। সকলেরই অধিকার আছে নিজ নিজ মত প্রচার করিবার। তাহা তাঁহাকে করিতে দাও। তাঁর প্রচারিত যে মতামত তোমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, তাহা এক কথায় অগ্রাহ্য কর। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। তাঁহার শিষ্য-বৃন্দের প্রতি কোনও দ্বেষমূলক ব্যবহার বা বাক্যালাপ করিও না। মহাকাল সময় মতন বিচার করিয়া দিবেন যে, কোন্ মত সত্য আর

কোন্ মত অসত্য। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধনে গভীরতর আগ্রহে ব্যাপকতর উদ্যমে মনোনিবেশ কর। ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮০

(৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ স্নেহময়ের নিকটে লিখিত তোমার সরল মনের সুন্দর পত্রখানা দেখিলাম। শুধু দেখিলাম নহে, পড়িলাম, তৃপ্ত হইলাম, মুগ্ধ হইলাম। তোমার পিতা ও মাতার মনে যেই সকল সদ্ভাব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সুগোপনে সংরক্ষিত ছিল, তোমার পত্রে তাহারই সন্ধান মিলিল। তুমি ধন্য যে, পিতৃমাতৃ-তপস্যাকে নিজ জীবনের কৃতিত্ব দিয়া প্রকটিত করিবার জন্য প্রবল ও অকৃত্রিম আগ্রহ অনুভব করিতেছ। জীবনে যাহাই কর, তাঁহাদের সেবা ও সন্তোষ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে করিতে হইবে, এই কথা মনে রাখিও। আমি আমার পিতামাতাকে ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, নিজ অযোগ্যতা বশতঃ তাঁহাদিগকে সেবা দিতে পারি নাই কিন্তু ভক্তি-ভালবাসার যে শুভফল আছে, জীবনের প্রতি পদে তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

প্রত্যক্ষ করিয়া বিগতভী হইয়াছি। তোমরাও কেহ কদাচ পিতৃমাতৃ-ভক্তিহীন হইও না। আমি মনে করি, পিতৃমাতৃভক্তিবর্জ্জিত ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

তোমার জীবনের উচ্চাভিলাষ সর্ব্বজীবহিতের ভিতর দিয়া সফল হউক, নিরন্তর এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তোমার পিতার কৈশোর ও যৌবনের দিনে তাৎকালিক যুবকদের মনে স্বভাবতই যে মহদ্‌ভাবগুলি প্রবল ছিল, আজিকালিকার যুবকদের ভিতরে তাহার একান্তই অভাব দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তোমার মনের পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম যে, সেই সত্য ভাব এখনো মরিয়া যায় নাই এবং যাইবে না। তোমার মতন ছেলেদের দিকে তাকাইলে নিরাশ বিষণ্ণ মন নবীন আশায় ভর করিয়া নূতন করিয়া সুখস্বপ্ন রচনা করিতে সাহসী হয়। এইখানেই যৌবনের জয়জয়কার, এখানেই নবযুগের অরুণোদয়। হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া এই জাতিটা বিবেকানন্দ-অরবিন্দের কম্বু কণ্ঠের ডাক একদা শুনিয়াছিল এবং তার কিছুদিন পরেই আবার অবসাদের মৌতাতে ঝিমাইতে লাগিল অথবা আত্যন্তিক রাজসিকতার বিক্ষিপ্ত বিকারে তালে বেতালে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। যেন এক তাণ্ডবময়ী অমানিশীথিনীর আবির্ভাব ঘটিল। বিশ্বাস দূরে গেল, বিনয় পলাইল, বিভ্রান্তি চোখে ঠুলি বাঁধিয়া চক্ষুষ্মানদিগকে অপথে বিপথে ঠেলিতে লাগিল। সেই সময়ে নূতন করিয়া জীবন-সঙ্কেত দেখিতে পাইতেছি তোমাদের সরস মনের সরল উক্তি হইতে,—আমরা ভগবানের কাজে জীবন সঁপিব, আমরা বিশ্বজনের হিতে করিব আত্মনিয়োগ। নীরোগ থাক, দীর্ঘায়ু হও, বলবন্ত উৎসাহে জীবনের প্রতিপাদক্ষেপে অর্জ্জন কর জয়কে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী
১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং শীঘ্রই শেষ হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে দিতে সমর্থ হও এবং কৃতকার্য্যতা অর্জন কর। নানা ওজুহাত তুলিয়া যাহারা পরীক্ষা পণ্ড করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের কার্য্য বা অভিপ্রায়ের প্রতি আমার অন্তরের এককণাও সমর্থন নাই। পিতামাতা কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পুত্রকন্যাদের সারা বছরের পড়ার খরচ চালাইয়াছেন। তারপরে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিবেন যে, পুত্রকন্যারা সাহসের সহিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক এবং ফলের দ্বারা নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিক। যাহারা অপরের পুত্রকন্যাদিগকে নিজেদের কোনও ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে পরীক্ষা দান হইতে বিরত করে, তাহারা কেবল দেশেরই শত্রু নহে, সমাজের ও সভ্যতার শত্রু। আশা করি, এবার তোমাদের পরীক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া কোনও দুর্ঘটনার পুনরাবর্ত্তন হইবে না।

পরীক্ষার পরে লম্বা ছুটি, কিছু কাজ করিতে চাহ, নির্দ্দেশনা চাহিতেছ। তোমাদের ঘরের কোণেই কাজের নির্দ্দেশ পাইবার ব্যবস্থা আছে। দ্রুত যোগাযোগ কর। আমি তোমার পত্রখানা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া দিতেছি।

আমার লিখিত পত্রখানা যথাস্থানে দেখাইও। কাজ যাহাই পাও, ছোট বলিয়া হেয় জ্ঞান করিবে না। ছোট কাজে সার্থক ও সফল

হইলে ঐ সার্থকতা এবং সফলতা হইতেই বড় কাজ জন্ম নেয়। আমার এই অতি ছোট্ট উপদেশটীকে বেদমন্ত্রের মত সত্য জ্ঞান করিবে। কলহ-বর্জ্জিত ভাবে অল্প কয়েক জনেও যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া যায়, তবে তাহার ফল অনেক বেশী হয় পরিমাণে আর দীর্ঘস্থায়ী হয় পরিণামে। ছোটবড় প্রতিটি কার্য্যের মধ্যে ঐক্যবলের অনুশীলনকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া নিবার চেষ্টা করিও। আর, নিজে একজন দামী কর্ম্মী, এই ভাবের কোনও অভিমান অন্তরে রাখিবে না। কাজ করিয়া তুমি কৃতার্থ হইতেছ, এই ভাব মনে মনে পোষণ করিবে। কাজ করিয়া বল বাড়িতেছে, তেজ বাড়িতেছে; যোগ্যতা বাড়িতেছে, আয়ু বাড়িতেছে, নিয়ত এইরূপ একটী অনুধ্যান চিন্তার মধ্যে জাগ্রত করিয়া রাখিবে। যে পাঁচ বন্ধু কার্ত্তিকের প্রতিধ্বনি পড়িয়া উৎসাহিত হইয়াছে, এই পত্র তাহাদের প্রতিজনের জন্য লিখিত হইল। প্রত্যেককে আমার স্নেহ ও আশিস দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

বারাণসী
১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংগঠন মাত্রেরই একটা নিয়ম অপরিহার্য্য যে, কোনও একটা বিষয়ে একটা নির্দ্ধারণ হইয়া গেলে সেই বিষয়ে নেতৃত্বের নির্দ্দেশ কর্ম্মী

মাত্রকেই কুণ্ঠাহীন মনে অম্লান বদনে পালন করিয়া যাইতে হইবে। আমি একটী বিষয়ে বিশেষ ঢংয়ের কোনও কাজ করিবার জন্য যদি কোনও কর্ম্মীকে নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যভার তাহাকে দিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাদের সকলের কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে তাহার কাজে প্রতি পদে সাহায্য করিয়া যাওয়া। ঘন ঘন নির্দ্দেশ-পরিবর্ত্তন চিন্তাশীল নেতৃত্বের লক্ষণ নহে। আমি যখন যে কর্ম্মটী ধরি, তখন সেই কর্ম্মটীর একেবারে চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ি না। আমার কোনও বাক্যকে সাময়িক উত্তেজনা বলিয়া তোমরা ভ্রম করিও না। আমি অবশ্যই ধীর স্থির প্রকৃতির, শান্ত স্বভাবের লোক নহি কিন্তু কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে আমি সহস্র বার চিন্তা করি এবং আনুপূর্ব্বিক সমগ্র পরিকল্পনাটীকে বিচার করি। যাহা যখন করিতেছি, ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিতেছি, পরিণাম হিসাব করিয়াই করিতেছি, হঠকারিতা করিয়া কিছুই করিতেছি না। আমার জীবনের অধিকাংশ কর্ম্মচেষ্টারই পরিণাম শোচনীয় অসাফল্য কিন্তু আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতেছি বলিয়াই কোনও গুরুতর অসাফল্যেও আমার মনে উদ্বেগ বা ক্লান্তি নাই।

জয় করিতে হইবে লক্ষ লক্ষ লোকের মন কিন্তু সে কাজটী কি করিবে তোমরা সুকৌশল অনৈক্যের দ্বারা? পারস্পরিক অবিশ্বাসের দ্বারা? যে কাজে যে যোগ্য, তাহাকে সে কাজ হইতে বিরত রাখার দ্বারা? বহুজনের বহুমুখিনী শক্তিকে একাগ্র ও একলক্ষ্য না-করার দ্বারা? আমি তাহা সম্ভব মনে করি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার একখানা পত্র বর্দ্ধমানে থাকার দিন পাইয়াছিলাম, যাহার প্রত্যেকটা অক্ষর একটা দৈব ভাব, একটা অপার্থিব সৌরভ, একটা অনির্ব্বচনীয় নির্বিষয়তা বহিয়া আনিয়াছিল। দেহের উর্দ্ধে রক্তমাংসের নাগালের বাহিরে, বাক্য ও মনের অগোচর এক পরম সত্তার দিকে তোমার সমগ্র অভিনিবেশকে প্রধাবিত হইতে দেখিয়াছিলাম। সেই সুন্দর স্বচ্ছ চিন্তাধারা নিয়ত তোমাকে পরিষিক্ত করুক। কারণ, তাহাই প্রকৃত নবজীবনের পন্থা, তাহাই স্থায়ী উজ্জীবনের উপায়।

কিন্তু মা, সাংসারিক কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বিদ্যার্জ্জন করিতে হইবে। জীবিকার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। সংসারের সহস্র প্রতিযোগিতার মধ্যে সসম্মানে উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। যাহারা স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার রাজত্ব চালাইতে চাহে, তাহাদের সৃষ্টিকরা কৃত্রিম দুর্দ্দিনকে পায়ের নখের টোকায় উড়াইয়া দিয়া বীর-বিক্রমে পথ চলিতে হইবে। অর্থাৎ জীবনকে কুহেলিকাচ্ছন্ন দার্শনিক বচনাবলীর দ্বারা আপাদমস্তক লুকাইয়া রাখিয়া সম্মুখস্থ সংগ্রামকে ফাঁকি দিলে চলিবে না।

সুতরাং দেহে ও মনে, শরীরে ও আত্মায়, কর্ম্মে ও রুচিতে, প্রবৃত্তিতে ও প্রকৃতিতে তোমাদের সাধনা করিতে হইবে সামঞ্জস্যের। আমি সেই সাধনার পথই তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

বারাণসী

চরিত্ত

১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তোমরা তোমাদের মণ্ডলী হইতে পর পর তিন বৎসর পুপুন্কী আশ্রমে বিস্তর তালের বীজ প্রেরণ করিয়াছিলে। তোমাদের ঐক্য, অধ্যবসায়, শ্রমক্ষমতা এবং ত্যাগের পরিচয় পর পর তিন বৎসর তোমরা দিয়াছ। তখন ভাবিয়াছিলাম, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মণ্ডলী কি যেন এক বিরাট আকার ধারণ করিয়া সকলের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোমরা এত তালবীজ দিয়াছিলে যে, যদি অন্য কোনও দেশ হইত, তবে অতগুলি বীজের দ্বারা আমি দশ হাজার বিঘা জমি জুড়িয়া একটা তালবাগান সাজাইয়া ফেলিতে পারিতাম। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটা গাছ ছাড়া আর সবই বৃথা হইল কেননা সে দেশের লোকেরা রাত্রি করিয়া মাটি খুঁড়িয়া সব তালবীজ তুলিয়া তার কোঁফড়া খাইয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিল। তালগাছ তেমন হয় নাই, ইহা ত

আফশোষ নাই। কিন্তু তালবীজ সংগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া একদা তোমরা নিজেদের মধ্যে যে অসাধারণ ঐক্যবল প্রদর্শন করিয়াছিলে, আজ সাধারণ সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাহার কোটি অংশের একাংশ ঐক্য যে পরিলক্ষিত হয় না, এর চেয়ে আফশোষের কথা আর কি হইতে পারে? ১লা জানুয়ারী মালটিভারসিটির দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার নরনারীর সমাবেশ হইবে, রৌদ্র বা শিশির হইতে মানুষের মাথাকে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া দিতে যে তালের ডালগুলি আসিবে, তাহারা তোমাদেরই দেওয়া তালবীজ হইতে উৎপন্ন। অথচ ঐক্যহীন বলিয়া তোমাদের আমি ডাকিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এস তোমরা পুপুন্‌কী আশ্রমে, মঙ্গল-সাগরের পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া যাও। এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর কি হইতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা পৌষ, বুধবার, ১৩৮০

(১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার দানশীলতায় মুগ্ধ হইলাম। যে দানের দ্বারা মানুষের ভিতরে জ্ঞান ও সদ্বুদ্ধির বিস্তার ঘটে, তাহা শ্রেষ্ঠ দান। দেবতার মন্দিরে স্তূপীকৃত স্বর্ণালঙ্কার আর হীরকখণ্ড বৃথা জমিয়া থাকিল, তেমন দানকে আমি বিশেষ বলিয়া মনে করি না। যে দান মানুষের মনের পরতে পরতে জ্ঞানের রক্ত সঞ্চারিত করিবে, তাহাই সার্থক দান।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বেশী মুগ্ধ হইলাম তোমার পত্রের এই কথাটুকু পড়িয়া যে আমার ভর্ৎসনাও তোমার নিকটে মধুময়। অহমিকা-প্রমত্ত অহঙ্কারী শিষ্য গুরুর কাছেও বন্দনা-গীতি প্রত্যাশা করে, প্রকৃত শিষ্য গুরুর তিরস্কারকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞান করিয়া উহার মধ্য হইতে জীবন-পথের প্রকৃত পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করে। নামে মাত্র শিষ্য না হইয়া তোমরা গুরুর প্রকৃত শিষ্য যেন হইতে পার, আমি তোমাদিগকে তদ্রূপ আশীর্ব্বাদই করিতেছি জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩রা পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঘণ্টা দশেক আগে তোমার নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে কিছু তিরস্কার বা বিরূপ মন্তব্য আছে। উহাতে কিছু মনে

করিও না। তোমার জেলারই একজন আমাকে এক পত্র লিখিয়াছে,—"বাবামণি, আপনি যখন রুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করেন, তখন সেই ভর্ৎসনাও আমার কাছে মধুময় লাগে। আমি তাহার ভিতরেও অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসার আস্বাদন পাই।" তোমার এই গুরুভাইটীর স্বচ্ছ, সুন্দর, সহিষ্ণু ও প্রেমালু হৃদয়টীর কথা চিন্তা কর। তাহা হইলেই দেখিবে যে, আমার কোনও রুক্ষবচন তোমাদের অপছন্দের বস্তু হইতে পারে না। আমি জগজ্জোড়া সকলের সঙ্গে তোমাদের প্রেমমধুর মিলন-সম্পর্ক দেখিতে চাহি। এইটীই আমার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। এইটীই আমার আদর্শ ও লক্ষ্য। ইহাই আমার ব্যাপক কর্ম্মপ্রেরণার মূল উৎস। পুকুর কাটিয়া গায়ে প্রচুর মাটি মাখিয়া আমি ব্যর্থ শ্রমের হতাশা লইয়া ঘরে ফিরিতে চাহি না পরন্তু চাহি যে পাতাল হইতে গঙ্গার ধারা ফুটিয়া উঠিয়া সহস্র সহস্র পথিকের তৃষ্ণা নিদূরণ করুক এবং আমি যে একজন কেহ ছিলাম একথা ধরিত্রীর প্রতিটি মানুষ বিস্মৃত হইয়া যাউক। আমার মনের এই অতীব যত্নে রক্ষিত গোপন সংবাদটী তোমরা এতদিনেও পাও নাই বলিয়াই কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছ না। যেখানে আমার আকূতি নিখিল বিশ্বকে মিলাইয়া এক করায়, সেখানে তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র গুরুভাইবোনদের গণ্ডীর মধ্যেও একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছ না। এর চেয়ে অধিক আফশোষের কথা আর কি হইতে পারে?

এই জন্যই লিখিয়াছিলাম যে তোমাদের মিলনের বাধা কি কি, বাধা সৃষ্টির কারণই বা কি, তাহা উপযুক্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমরা সমূলে এই অনৈক্যের বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করিবার কাজে লাগিয়া যাও। আমার তিরস্কার নিষেধাত্মক নহে, আমার তিরস্কার নিয়োগাত্মক।

তোমার গানগুলি পাইয়াছি। একটী মাত্র পাঠ করিতে পারিয়াছি, সময় হাতে নাই। শরীর অপটু। সম্মুখে বিরাট কাজ— মালটিভারসিটী দ্বারোদ্‌ঘাটন। জনা ত্রিশেক শ্রমিক, আশ্রমের কর্ম্মিদল, আমি ও মায়ের মাথ্যের অতিরিক্ত শ্রমে বিব্রত। তবু জিদ করিয়া দুই দশখানা পত্র লিখিতেছি। তোমার একটী গান আমি খুবই পছন্দ করিয়াছি। ছন্দের ত্রুটি আছে। সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলাম। তদ্রূপই যেন ছাপান হয়। তদ্রূপই যেন গাওয়া হয়। নিজের রচনার উপরে যদি গুরুদেবও কাটাকুটি করেন, তাহা হইলে রচয়িতা বিরক্ত হন, এটা স্বাভাবিক। আর গানের রচনায় ছন্দ-পতন ঘটিলেও সুগায়ক সুর দিয়া বা তালের বিশেষত্ব দিয়া সেই পতনকে ঢাকিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সুখশ্রাব্য অধিকাংশ গানই সুখপাঠ্য কবিতাও বটে। সুতরাং দুই একটী অক্ষরের বা শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে যদি সুখশ্রাব্য হয়, তবে তাহা করা দোষের নহে। ইংরাজি ১৯০৫ হইতে ১৯০৮-৯-১০ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গানের জোয়ার আসিয়াছিল। সেদিন গানের রাজা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ। তাঁহারা সঙ্গীত-রচনায় যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ছান্দসিক সুসম্পূর্ণতার অনেক সুদৃষ্টান্ত আছে। তোমরা তাহার যাট-পয়ষট্টি বৎসর পরে যে গান রচনা করিতেছ, তাহার রচনার ঢং এবং কথার বাঁধুনি একেবারে ঠানদিদির আমলের হইলে লোকে খুশী হইবে কি? এই জন্য ভাবকে প্রধান রাখিয়া শব্দচয়নে ও গ্রন্থনে তোমাদের কিছুটা সমসাময়িক হইতে হইবে। তবে, একটা বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত যে, পল্লীগ্রামের প্রতিটি অশিক্ষিত মানুষের কাছে তোমাকে তোমার সঙ্গীতের পসরা নিয়া পৌছিতে হইবে। তাহাদের সরল মনে সরল প্রাণের স্পর্শ

জাগাইতে হইবে। অতি-কবিত্ব বা আলঙ্কারিক অসাধারণত্ব তাহারা বোঝে না, তাহাদের কাছে তাঁদের মতন সোজা করিয়া সব জিনিষ উপস্থাপিত করিতে হইবে। সুর-সংযোজনের দিক দিয়া কাহাকে তোমরা কয়েকজন খুবই দক্ষ এবং শ্রীভগবান্ তোমাদের অনেককে অতুলনীয় কণ্ঠ-সম্পদও দিয়াছেন। এমত অবস্থায় তোমরা প্রতি পল্লীর প্রতিটি প্রাণের দুয়ারে তোমাদের আদর্শের আবেদন যদি কথা ও সুরের মধ্য দিয়া পৌঁছাইবার ব্যাপক চেষ্টা কর, তবে তাহার ফল হইবে অপরিসীম ও অপরিমেয়। লোক-সঙ্গীতের ঢংয়ে যতগুলি পার গান রচনা করিয়া সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অভিযান চালাও। সঙ্গীতগীতির কি মহিমা, তাহা আমরা অতি কৈশোরে ১৯০৫-০৬এ দেখিয়াছি। ঠিক সেই জিনিষটার আবির্ভাব ১৯২১শে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় নাই। অবশ্য উভয় যুগই রাজনৈতিক উত্তাপ ও নবজীবন সৃষ্টির যুগ। এখন তোমাদের সংগঠনের সুবর্ণ দশার যুগ। এই যুগে বিশ্বব্যাপী প্রাণ-সঙ্ঘনের আদর্শের সহিত যুক্ত থাকিয়া তোমাদের কাজ করিতে হইবে। তোমার বোধ হয় সতের বৎসর এখন বয়স হইল। কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? অশীতিযৌবনং পুংসাম্—পুরুষের যৌবন আশী বছরে, এই সূত্র ধরিয়া চল। আমৃত্যু যুবকের শক্তি, যুবকের উৎসাহ, যুবকের অফুরন্ত উদ্যম, যুবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া কাজ করিয়া যাইবে। তবে, সকলকে একত্র কর। যত সুরসাধক, সঙ্গীতজ্ঞ ও কাব্যানুরাগী জেলায় যে যেখানে আছে, প্রত্যেকে প্রথমে কর নিজেদের মধ্যে মিলনের সাধনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষময় অনুশীলন নহে, পরিপূরণের উদ্দেশ্য নিয়া একে অন্যের সঙ্গে সহযোগ কর। দেখিবে, কি অসামান্য এক বৃন্দবাদন তোমাদের সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

প্রাণ দিয়া ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই তোমার কাছে কাজের কা
কিছু প্রত্যাশা করি। তোমার বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, স্বর জ্ঞান
আছে, অল্লাধিক কবিত্বও আছে, মানুষকে বশ করিবার বড় একটা
বিদ্যা তোমার করতলগতা। তোমার কাছে বিশেষ বিশেষ কাজ
প্রত্যাশা করিব না ত কাহার দিকে ধাবিত হইবে আমার পিপাসু
নয়ন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস
নিও।

তোমাদের জীবিকার্জ্জনের কর্ম্মস্থলটীর মতন নিরাপদ স্থানেও
সরকারী অপদার্থতার ফলে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া বিদ্যুতের অভাবে
কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিতেছে জানিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তবে কি
আমাদিগকে আবার সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রবেশ করিতে হইবে, যেই
যুগে বিদ্যুৎকে কেহ জানিত না, চিনিত না, চকমকি পাথর দিয়া
প্রদীপের পলিতা ধরাইত? প্রতিশ্রুতি দানে কল্পতরু মেরুদণ্ডহীন
বাচালগুলির উপরে ভরসা করিয়া শাসন-কার্য্যের ভার দিয়া সমগ্র জাতি
আজ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। জানিনা, ইহার শেষ পরিণতি কোথায়।

সমগ্র পৌষ মাস জুড়িয়া তোমরা নানা পুণ্যময় শুভানুষ্ঠান রাখিতেছ, জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে জীব-হিত-কামনায় যে-কোনও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই আমার প্রীতি এবং তৃপ্তি। প্রত্যাসন্ন ও আতঙ্কিত ব্যাপক রেল-ধর্ম্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা যে অধিকাংশেই পুপুন্‌কীর অনুষ্ঠানটীতে আসিতে পারিবে না এইবারকার আনন্দময় পৌষ মাসের মধ্যে এইটুকুই মাত্র বিষাদ-রেখা। দুই চারি দিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে যে, বহু-বিজ্ঞাপিত অনভিপ্রেত রেল ধর্ম্মঘটটী সত্য সত্যই আসে কি না। বন্ধ আর ধর্ম্মঘট যেন এক হিড়িকে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালকেরা নিজেরা সততা-সম্পন্ন ও নিঃস্বার্থ না হইলে এই সকল উৎপাতের মোকাবিলা করা অসাধ্য ব্যাপার। নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্যম দেশের মেরুমজ্জাতে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে। এই সময়ে তোমার বা আমার মতন নিরীহ জীবহিতকামীর সাহস করিয়া কালপ্রতীক্ষা করা ছাড়া আর গতি নাই।

কলিকাতার হেদুয়ার পার্কে তোমরা যে অনুষ্ঠানটী কিছুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছ, তাহার সুফল যে সুদূরপ্রসারী, এই কথাটা সংশ্লিষ্ট সকলে বোঝে। শ্যামবাজার তার নিজের সন্দেশ নিজেই খাইবে, বাগবাজার তার বিখ্যাত রসগোল্লা নিজেরাই গিলিবে, বৌবাজার ভীমনাগের দোকানের বাহিরে কোনও সওদা করিবে না, ব্যাপার যদি এইরূপই চলে, তবে হেদুয়ার পার্কে তোমাদের অনুষ্ঠান জমান বড় কঠিন। ভারতের এক মহান্ আত্মত্যাগী দেশসেবক এই হেদুয়ার পার্কে আসিয়া একদা আমার সান্নিধ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, নিজের ঈশ্বর-বিশ্বাসী না প্রচলিত ধর্ম্মমত-সমূহের তত্ত্ব জানিতে আগ্রহী না হওয়া সত্ত্বেও

আমার সহিত অমর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই হিসাবে দেওঘর পার্ক তোমাদের কাছে এক সুমহৎ তীর্থক্ষেত্র। তোমরা যদি কলিকাতার ব্যাপারেই আঞ্চলিকতা-দোষ পরিহার করিতে না পার, তাহা হইলে অসমিয়া, ওড়িয়া ও বিহারীরা আঞ্চলিকতার উত্তেজনায় তোমাদের উৎপীড়ন করিলে তোমরা কোন্ যুক্তিতে "উহু" শব্দ উচ্চারণ করিবে, বল দেখি? যাহারা অতিরিক্ত শ্যামবাজারী, অতিরিক্ত বাগ্‌বাজারী বা অতিরিক্ত বৌবাজারী ফলাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও যে, তাহা হইলে কাঁকুরগাছির গুরুধামটা কোন্ বাজারের আওতায় আসিবে? তোমাদের যদি সঙ্কীর্ণতা না কমে, তাহা হইলে গুরুধামের দুয়ার তোমাদের জন্য বন্ধ করিয়া দিব। আমি সকলকে মিলাইবার জন্য দিয়া থাকি দীক্ষা, কিন্তু বিভেদই যদি ইহার সঙ্গাত হয়, তাহা হইলে দীক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। গুরুধামের দ্বার আর খোলা হইবে না।

এই পত্র প্রত্যেককে দেখাইও। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮০
(২১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

সবাই যার যার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত, এজন্য আমার কাজ করিবার মত কোথাও কেহ নাই। লিখিয়াছ ভাল। কিন্তু আমার কাজটা যে তোমার নিজের কাজ, একথা যতদিন না বুঝিবে, ততদিন তোমাদের কোনো নিজের কাজই সিদ্ধ হইবে না, সফল হইবে না, সুসম্পাদিত হইবে না। জগতে আমার নিজস্ব প্রয়োজনের বস্তু আজ আর কিছুই নাই, সুতরাং আমার নিজের জন্য কাজ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। তথাপি যে আমি অফুরন্ত উদ্যমে কাজ করিয়া যাইতেছি, তাহা ত তোমাদের কাজকে নিজের কাজ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি বলিয়া। তোমরা অজ্ঞান এবং মূর্খ বলিয়া এই সহজ সত্যটা বুঝিতে পারিতেছ না। একদা একথা তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। তবে, আমি চাহি অনেক দুঃখের ও অসহ ক্লেশের মধ্য দিয়া যেন বুঝিতে না হয়। জনে জনের কাছে কত পত্র লিখি, জনে জনের সঙ্গে কত কথা বলি, জনে জনের কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া যাই,—তাহা ত এই জন্য যে ব্যক্তি আমার নিকটে তুচ্ছ নহে। বহু ব্যক্তির সমবায়েই ত একটা জাতি, বহু জাতির সমন্বয়েই একটা দেশ, বহু দেশের সমাবেশেই ত একটা জগৎ। তুচ্ছ করিব কাহাকে? সর্ব্বাপেক্ষা যে ছোট, সেই আমার নিকটে অধিকতর আদরের বস্তু এই কারণে যে, তার মতন আরও লক্ষ-কোটি ছোটকে একত্র করিতে পারিলেই আমি ভূমির বুকে ভূমাকে নামাইতে পারিব। তোমরা আমার বাগ্মিতাই শুধু শুনিলে, আমার প্রাণটার ত কোনও পরিচয় নিবার চেষ্টা কেহ করিলে না। সবাই বলিতেছ, তোমাদের সময় নাই। আমি বলিব, সময় যথেষ্ট আছে, তবে তোমরা অন্ধের মত চ'খ বুজিয়া রহিয়াছ বলিয়া সময়টুকুকে দেখিতে

পাইতেছ না। দুহাতের তালু দিয়া চখ একটু রগড়াইয়া লও—সময় যে আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

অন্তরে অনুরাগ থাকিলে অসময়ের মধ্যেও সময় সৃষ্টি করিয়া লওয়া যায়। তোমাদের সময় নাই মানে তোমাদের অনুরাগ নাই। সাধন ত কেহই কর না। সাধন না করিলে অনুরাগ কি আপনি ফুটিবে? সাধনই যদি করিবে না, তবে দীক্ষা নিয়াছিলে কেন? অন্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া আর আমার কাছে নেওয়া এই দুইয়ে তফাৎ আছে। আমি কাহাকেও ক্রীতদাস করি না। আমি শিষ্যের উপরে পার্থিব কোনও প্রতিদানের দাবী রাখি না। আমি শিষ্যকে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করি। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা দীক্ষাও নিবে, সাধনও করিবে না, ইহা ত চলিতে পারে না। সাধন করিলে মানুষের মন স্বচ্ছ হয়, স্বচ্ছন্দ হয়, সাবলীল হয়, কুটিলতা-বর্জ্জিত হয়, সুন্দর হয়। অনুরাগের জন্ম সেখানে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(একত্রিংশতম খণ্ড সমাপ্ত)